ইমামুল মুজাহিদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ
এর স্মৃতিচারণ

# ইমামের সাথে অতিবাহিত দিনগুলো

শায়েখ আয়মান আয যাওয়াহিরী

# ইমামের সাথে অতিবাহিত দিনগুলো

শায়েখ আয়মান আয জাওয়াহিরী রহ.

## উৎসর্গ

উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা। কুফফারদের নির্যাতনে জান্নাতের সুধা পান করা শিশু, নারী, বৃদ্ধরা। পুরুষের হুংকার যেখানে থেমে গিয়েছে, সেই জনপদের পুনরুত্থানে আবার সিংহরা জেগে উঠুক

# ইমামের সাথে অতিবাহিত দিনগুলো

## পর্ব ১

বিশ্বের আনাচে-কানাচে অবস্থানকারী আমার মুসলিম ভাইগণ! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

হামদ ও সালাতের পর-

সম্মানিত ভাইয়েরা আমাকে অনুরোধ করেছেন- মুজাহিদ, মুজাদ্দিদ, ইসলামের সিংহ, বীরপুরুষ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর সাথে আমার অতিবাহিত সময়গুলোর এবং তাঁর মানবিক দিকসমূহ নিয়ে কিছু স্মৃতিচারণমূলক আলোচনা করার জন্য। কারণ, তাঁর এই উন্নত, মহৎ ও সুউচ্চ দিকটির ব্যাপারে অধিকাংশ মুসলিমরাই জানে না। তাছাড়া এ ব্যাপারে সেই ব্যক্তিই ভালো জানতে পারবেন, যার এই উন্নত চরিত্রের, চেতনাবান, উদারতা ও বদান্যতার অধিকারী সেই মহান ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভের সুযোগ হয়েছে। আলহামদু লিল্লাহ, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা আমাকে দীর্ঘ দিন সফরে ও বাসস্থানে এবং সুখে-দুঃখে এই মহান ব্যক্তির সাথে থাকার তাওফীক দান করেছেন। এ কারণে আমি তাঁর উন্নত গুণাবলী খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। আমি তা থেকে কিছু স্মৃতি আমার ভাইদের নিকট তাদের চাহিদা অনুযায়ী উপস্থাপন করার চেষ্টা করবো। আর সম্মানিত ভাইদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি যে, এ ক্ষেত্রে আমার কথাগুলো হবে ধীরগতিতে। যার দ্বারা অন্তরসমূহ বিগলিত হবে। (ইনশা আল্লাহ)

মাশাআল্লাহ! শাইখ রহ. এর অনেক স্মৃতি রয়েছে। এমনিভাবে তার অগণিত ফায়দাও রয়েছে। আমি এ সম্পর্কিত কিছু বিষয় খাতায় লিপিবদ্ধ করেছিলাম। এই মুহূর্তে আমার যতটুকু স্মরণ আছে, সে অনুযায়ী আপনাদের সামনে আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ। আশা করি, আল্লাহ তা'আলা সহজ করে দিবেন। এই মহান ব্যক্তির আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে আমরা পরবর্তীতে আরো আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।

যিনি শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর সাহচর্য পেয়েছেন, তিনি জানবেন যে, শাইখ খুবই বিশ্বস্ত একজন মানুষ ছিলেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে তাঁর সাথে আমাদেরকে রাখুন। তিনি সাথীদেরকে উত্তম উপদেশ দিতেন এবং তাদের ভালো দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করতে ভালবাসতেন। শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. উত্তম চরিত্রের অধিকারী একজন ধৈর্যশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নির্বোধ প্রকৃতির ছিলেন না এবং হুলস্থুলও করতেন না। যখন তিনি অনুভব করতেন, মুজাহিদগণ যুদ্ধের ময়দানে নির্যাতিত এবং অধিকারহারা, তখন তিনি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়তেন। বিশেষকরে তাঁদের ব্যাপারে, যারা দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁর সাথে ছিলেন। যেমন শহীদ আবু উবাইদা বানশিরি রহ.। যিনি বর্তমান সময়ে যুদ্ধের ময়দানে পাহাড়তূল্য। শহীদ শাইখ আবু হাফস আল-মিসরি (রহ.)। যিনি কমান্ডার আবু হাফস কুমান্দান নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের ও সকল শুহাদাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। শাইখ উসামা রহ. অধিকাংশ সময় তাঁদের উত্তম আলোচনা করতেন এবং তাঁদের জন্য রহমতের দু'আ করতেন।

আমার মনে পড়ে, আফগান জিহাদের সময় একদিন তিনি আমাকে বলেছেন, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা আমাকে জিহাদের ময়দানে আসার সৌভাগ্য দান করেছেন। যার ফলে আমি পরিচিত হতে পেরেছি শাইখ আবু উবাইদার মতো ব্যক্তির

সাথে। আমার আরো মনে পড়ে, আফগানিস্তানে ক্রুসেডার আমরিকার যুদ্ধের সময় এই দুইজন বীর সিংহ পুরুষের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মিডিয়া দুর্নাম করেছিল। তখন তিনি আমাকে বলেছেন, এদেরকে যথাযথ উত্তর দিয়ে দিন, যারা আমাদের ভাইদের বদনাম করে। তারপর আমি আমার বিভিন্ন বয়ানে এবং আমার কিতাব فرسان تحت راية النبي নামক কিতাবের দ্বিতীয় সংস্করণে এই মহান ব্যক্তিগণের উত্তম চরিত্রের ব্যাপারে আলোকপাত করেছি।

এমনিভাবে শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. ইমামুল জিহাদ শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. এর কথা খুব স্মরণ করতেন এবং বলতেন, এই মহান ব্যক্তি বর্তমান যুগে জিহাদকে পুনর্জীবন দান করেছেন। তিনি আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. এর খুব প্রশংসা করতেন।

অনুরূপভাবে শাইখ উসামা রহ ৯/১১ এর ১৯ জন শুহাদাকে খুব মুহাব্বত ও জযবার সাথে স্মরণ করতেন। যারা যুগের হুবাল আমেরিকার সামরিক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পেন্টাগন এবং তাদের অর্থনৈতিক গৌরব নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস করেছিলেন। আর তাদের চতুর্থ বিমানটি ছিল হোয়াইট হাউজ কিংবা কংগ্রেসমুখী। শাইখ উসামা রহ. এই ১৯ জন শুহাদার কথা খুব ভালোবাসার সাথেই স্মরণ করতেন। আপনারা জেনে রাখুন! শাইখ উসামা রহ. যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর তোরাবোরা পাহাড়ে সর্বপ্রথম এই ১৯ জন শুহাদার আলোচনা রেকর্ড করেছেন। আপনারা অবশ্যই দেখেছেন যে, তখন শাইখের চেহারা খুব ক্লান্ত ও মলিন ছিল। কারণ, তখন আমাদের অবস্থা এমন ছিলো যে, সেখানে কনকনে শীত, সীমিত খাবার, অল্প ঘুম ও সামান্য পানি বিদ্যমান ছিল। তাছাড়া পানির স্তর আমাদের অবস্থানস্থল থেকে প্রায় ৫০০ মিটার নিচে ছিল। তাও আবার প্রচন্ড ঠান্ডায় জমাট বাধা ছিল। এই কঠিন মুহূর্তে মুনাফিক দুশমনরা আমাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও

করে রেখেছিল। আর ক্রুসেডাররা ওপর দিক থেকে বোমা বর্ষণ করছিল। এমন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায়ও শাইখ উসামা রহ. সেই ১৯ জন বীর শুহাদার সাথে তাঁর অঙ্গীকার পূরণের কথাগুলো রেকর্ড করেছেন। অথচ তখন তাঁর এই কথা বলার সুযোগও ছিল যে, এই মুহূর্তে তিনি শহীদ হয়ে যেতে পারেন।(তাই আলোচনা রেকর্ড করবেন না।)কিন্তু না! তারপরেও তিনি সেই ১৯ জন ভাইয়ের আলোচনা রেকর্ড করবেনই। আমরা অন্য আলোচনায় তোরাবোরা পাহাড় এবং ঐ সময় সেখানে অবস্থানরত মুজাহিদ ভাইদের বীরত্ব ও দৃঢ়তা সম্পর্কে আলোকপাত করবো, ইনশা আল্লাহ।

আমার মুসলিম ভাইয়েরা! তোরাবোরার ঘটনার ব্যাপারটি আমরা আল্লাহর সোপর্দ করে দিলাম। তখন মুনাফিক বাহিনী আমাদেরকে চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছিল। অন্যদিকে ওপর দিক থেকে ন্যাটো বাহিনী বোমা বর্ষণ করছিল। আমরা যেখানে অবস্থান করছিলাম, দুশমন সেখানেও হামলা করেছিল। আর মুজাহিদ ভাইয়েরাও আমরণ লড়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিল। সে সময় ক্রুসেডার সৈনিকদের কাপুরুষতা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং তারা যেই শক্তির বড়াই করতো; তা ধূলিস্মাত হয়ে গিয়েছে। তাদের ভীরু সৈনিকরা ইসলামের মাত্র ৩০০ বীর সিংহের সাথে লড়াই করতে ভয় পেয়েছিল। মূলত: আল্লাহর ইচ্ছা এমনি ছিল যে, শাইখ উসামা রহ. নিরাপদে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়বেন এবং তিনি পুনরায় এই ক্রুসেডারদের সাথে বিশ্ব জিহাদের নেতৃত্ব দিবেন। পাশাপাশি ঈমানদাররাও যেন বুঝতে পারে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই একক ক্ষমতাবান। যিনি ইরশাদ করেছেন-

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿النساء: ١٠٤﴾

তাদের পশ্চাদ্ধাবনে শৈথিল্য করো না। যদি তোমরা আঘাত প্রাপ্ত, তবে তারাও তো তোমাদের মতই হয়েছে আঘাতপ্রাপ্ত এবং তোমরা আল্লাহর কাছে আশা কর, যা তারা আশা করে না। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (৪: ১০৪)

সারকথা হলো: শাইখ উসামা রহ. এমন কঠিন সময়েও সেই ১৯ জন শুহাদার বয়ান রেকর্ড করার জন্যে দৃঢ় সংকল্প করেছেন এবং তাঁদের সহিত নিজের অঙ্গীকার পূরণের কথা প্রকাশ করেছেন। যুদ্ধের পর শাইখ উসামা রহ. তোরাবোরা থেকে সফলভাবে বের হয়ে সর্বপ্রথম যেই বয়ান রেকর্ড করেছেন, তাও ছিল এই ১৯ জন শুহাদা সম্পর্কিত। তাঁদের প্রত্যেকের আলোচনা শাইখ আলাদা আলাদা করেছেন।

এমনিভাবে শাইখ উসামা রহ. শাইখ আব্দুর রহমান কানেডি রহ.কেও অনেক ভালবাসতেন। তিনি আমাকে পত্রের মাধ্যমে শাইখ আব্দুর রহমান রহ. সম্পর্কে আলোচনা করতে বলেছেন। যাতে মানুষ তাঁর মর্যাদা ও মাকাম সম্পর্কে জানতে পারে। তাই আমি আমার এক বয়ানে তাঁর হিজরত, বদান্যতা ও উত্তম গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করেছি। তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে প্রথম সারিতে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেছেন।

এমনিভাবে শাইখ উসামা রহ. এর ইবনুশ শাইখ আল-লিবি রহ. এর সাথেও খুব অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। শাইখ উসামা রহ. আমাকে বলতেন, এই ব্যক্তি নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছে। তোরাবোরায় যুদ্ধের নেতৃত্ব ছিল শাইখ আল-লিবি রহ. এর ওপর। যখন শাইখ উসামা রহ. এর ময়দানে সামরিক নেতৃত্বের বীরত্ব নিয়ে আলোচনা করবো, তখন আমরা এটাও আলোচনা করবো যে, কোন অবস্থায় এবং কীভাবে শাইখ উসামা রহ. শাইখ লিবি রহ. এর ওপর মুজাহিদদের সর্ববৃহৎ অংশকে তোরাবোরা থেকে পাকিস্তানে নিয়ে আসার গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। যখন ক্রুসেডাররা আক্রমণ করেছিল, অপরদিকে দুশমন চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছিল, ক্ষুধা-পিপাসায় সকলের কাতর অবস্থা এবং পুরা আফগানিস্তানে বিস্তৃত শত্রু বাহিনী; তখন শাইখ লিবি রহ. মুজাহিদদেরকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে পাকিস্তান সীমান্তে প্রবেশ করেছেন। সেখানে ক্রুসেডাররা তাঁদের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি।

তবে পাকিস্তানের কিছু লোক তাঁদের সাথে গাদ্দারি করেছে। যা খুবই প্রসিদ্ধ ঘটনা। পাকিস্তানের প্রশাসন তাঁকে কোহাট জেলে বন্দী করে। সে সময় শাইখ লিবি রহ. এর সাথে মুজাহিদদের খরচের জন্য অনেক টাকা ছিল। পাকিস্তান প্রশাসন তাকে প্রস্তাব দিল, এই অর্থের বিনিময়ে তারা শাইখকে ছেড়ে দিবে এবং তাঁর নামও গোপন রাখবে। যেন তার নামে কোন মোকদ্দমাই হয়নি। তখন লিবিয়ার সেই শাহসাওয়ার যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, তা আজো মুসলিম যুবকদের জন্যে; বিশেষত: লিবিয়ার যুবকদের জন্যে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যাদের বিজয় হবে ইসলামের বিজয়। তাদের মধ্য হতে এক লিবির অবর্তমানে লক্ষ লিবি বের হবে। যখন পাকিস্তান অফিসাররা তাঁকে এই প্রস্তাব দিল, তখন তিনি বলেছেন, আমি আমার সাথী ভাইদেরকে কখনো ছেড়ে যাবো না। বরং তোমাদেরকে এই টাকার সাথে আরো বাড়িয়ে দিবো। বিনিময়ে তোমরা আমাদের সবাইকে ছেড়ে দাও। পাকিস্তান প্রশাসন এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। ফলে শাইখ রহ. সাথীদের সাথে বন্দী জীবন কাটাতে লাগলেন। অতঃপর বেইমান গাদ্দাফী প্রশাসন তাঁকে শহীদ করে দেয়। ইনশা আল্লাহ, সেই দিন বেশি দূরে নয়; যেদিন লিবিয়ার আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন, ইসলাম ও রাসূলপ্রেমী সম্মানিত মুজাহিদ ভাইয়েরা গাদ্দাফী থেকে এবং ন্যাটো থেকে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। যারা তাঁকে বন্দী করেছে এবং গাদ্দাফীর হাতে সোপর্দ করে দিয়েছে। শাইখ উসামা রহ. বলতেন, এই ব্যক্তি নিজেকে জিহাদে সঁপে দিয়েছে।

শাইখ উসামা রহ. আমার কাছে চিঠি পাঠাতেন। তাতে শাইখ মুস্তফা আবুল ইয়াযিদ রহ. এর কথা উল্লেখ করতেন। শাইখ উসামা রহ. আমাকে বলতেন, ইনি আমাদের স্বার্থে তাঁর নিজেকে এবং তাঁর খান্দানকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। তিনি মুজাহিদ ভাইদের অবস্থা দেখাশুনা করতেন এবং তাদের মধ্যকার যোগাযোগের ব্যবস্থা

করতেন। আনসার ও মুহাজির ভাইদের যে কোনো সমস্যার সমাধান করতেন। বরং তিনি তাঁদের সকলের জন্য একজন হৃদয়বান পিতৃতুল্য মানুষ ছিলেন। এই সব কিছুর বিনিময়ে শাইখ রহ. ও তাঁর পরিবারকে ন্যাটো গোয়েন্দারা শহীদ করে দিয়েছে। তাদের হাত থেকে শাইখ মুস্তফা আবুল ইয়াযিদ রহ. এর ছোট মাসুম বাচ্চারা পর্যন্ত রেহাই পায়নি। যাদেরকে শাইখ আপন তত্ত্বাবধানে হাফেজে কুরআন বানিয়েছেন। এই সব হলো সেই মহামানবের গুণাবলী; যিনি তাঁর অঙ্গীকার সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আমার মুসলিম ভাইয়েরা! এই মজলিসে আমার আরো স্মরণ আসছে, শাইখ উসামা রহ. এমন একজন সিংহ পুরুষ ছিলেন, আমেরিকার মানুষ স্বপ্নের মাঝেও শাইখ উসামা রহ. বুশকে হুমকি দিচ্ছেন, এমন কিছু দেখে আঁতকে উঠতো। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ ব্যাপারটি জানতো না যে, শাইখ উসামা রহ. ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী, ধৈর্যশীল এবং লাজুক প্রকৃতির। তাঁর মাঝে পূর্ণমাত্রায় ছিল উত্তম চরিত্রের গুণাবলী। যারা তাঁর সাথে উঠাবসা করেছেন, তারা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে, শাইখ রহ. কেমন উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন! উদাহরণস্বরূপ: আমার সাথে শাইখ উসামা রহ. এর একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। যা থেকে তাঁর নরম তবিয়ত তথা কোমল স্বভাব স্পষ্টত: বুঝে আসে।

ঘটনাটি হলো: তখন আমরা তোরাবোরায় অবস্থান করছিলাম। আমার নিকট আমার স্ত্রীর শাহাদাতের সংবাদ পৌঁছল। আল্লাহ তাঁদের প্রতি এবং তাঁদের সাথে যারা শহীদ হয়েছেন, সব ভাইদের প্রতি রহম করুন! এই সংবাদ যিনি নিয়ে এসেছিলেন; তিনি আমাদেরই একজন ভাই ছিলেন। শাইখ উসামা রহ. চেয়েছিলেন, সে যেন আমার সাথে কথা না বলে। কিছুক্ষণ পর যখন ফজরের নামাজের সময় হলো, তখন শাইখ আমাকে ইমামতি করতে বললেন। নামাজের পর আমরা যিকির-আযকারে

মশগুল ছিলাম। আমি দেখছিলাম, নামাজের পর ভাইয়েরা একের পর এক সেখান থেকে উঠে যাচ্ছে। আমি আমার জায়গায় বসা ছিলাম। তারপর সেই ভাই আমার কাছে আসলেন। পরস্পর সালাম বিনিময় হলো। তিনি আমাকে আমার স্ত্রীর শাহাদাতের সংবাদ শোনালেন। আমাকে জানালেন, আমার স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে এবং আমাদের আরো তিনজন ভাই তাঁদের সন্তানসহ শাহাদাত বরণ করেছেন। আমি 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়লাম এবং আল্লাহর নিকট সবর ও আজরের দু'আ করলাম। ঠিক তখনি শাইখ উসামা রহ. এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, একেবারে অশ্রুসজল অবস্থায়। তারপর এক এক করে সাথীরা আমার কাছে আসছিল, আর আমাকে শান্তনা দিচ্ছিল। আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল, আমরা এখান থেকে অপর এক স্থানে চলে যাবো। এ সময় শাইখ উসামা রহ.ও আমাদের সাথে ছিলেন। আমরা প্রায় ত্রিশ জনের ওপরে ছিলাম। শাইখ উসামা রহ. ভাইদের এক বৃহৎ অংশকে অন্য কোথাও চলে যেতে বললেন । আর আমার উদ্দেশ্যে বললেন, আমি, তুমি ও আরো কিছু ভাই এখানে থাকবো। আমি বললাম, আমরা এখান থেকে চলে যাই। সফর তো মানুষের দুঃখ-কষ্ট মুছে দেয়। পরে অবশ্য শাইখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেখানেই থেকে গেলাম। এমনকি আমার অন্তর থেকে দুঃখ-বেদনাও দূর হয়ে গেল। আমি আল্লাহর কাছে দু'আ  করলাম- তিনি যেন আমাদের পরিবারকে উত্তম প্রতিদান দান করেন এবং তাঁদের থেকে আমাদের মাহরুম না করেন। আমাদেরকে শাহাদাতের মৃত্যু দান করেন, মুসলমানের মৃত্যু নসীব করেন। তারপর আমি যখনি আমার ছেলে মুহাম্মাদের কথা শাইখ উসামা রহ. এর কাছে বলতাম, তখনি তাঁর চোখে অশ্রু এসে যেতো। আমি তাঁর চোখে অশ্রু দেখতাম!

আরেকটি ঘটনা: যা আমার স্মরণ হয়েছে। আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তিনি হলেন একমাত্র ব্যক্তি; যিনি আমাকে সর্বপ্রথম আমার মায়ের ব্যাপারে শান্তনা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি অগণিত রহমত বর্ষণ করুন! আমাদেরকে মুসলমানের মৃত্যু নসীব করুন! শাইখ উসামা রহ. আমার কাছে একটি পত্র লিখে আমাকে খুব শান্তনা দিলেন। আমি তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করে বললাম, শাইখ আপনি আমার আগেই আমার মায়ের শাহাদাতের সংবাদ জেনেছেন! আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন!

অন্য আরেকটি ঘটনা: যা আমার মনে পড়ছে। তা হলো: যারা শাইখ উসামা রহ. এর নৈকট্য লাভ করেছেন; তারা জানবেন যে, তিনি খুবই কোমল প্রকৃতির লোক ছিলেন। অল্পতেই কেঁদে ফেলতেন। যখনি তিনি ভাষণ দিতেন, খুব কাঁদতেন। একবার তিনি আমাকে বললেন, অনেকে আমাকে বলে থাকে, শাইখ আপনি আলোচনা শুরু করার আগেই কেঁদে ফেলেন! আপনি চাইলে আরেকটু নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। তখন তিনি এ বিষয়টি নিয়ে আমার সাথে আলাপ করলেন। তিনি বললেন, আমি এখন কি করতে পারি? আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! শাইখ, এটা তো আপনার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত। যা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দান করেছেন।

শাইখ উসামা রহ. এর কোমলতার আরেকটি ঘটনা: যা আমি নিজ চোখে শাইখ উসামা রহ. এর মাঝে দেখেছি। তা হলো: আমরা একবার দক্ষিণ কাবুলে আইনাক প্রশিক্ষণ শিবিরে ছিলাম। শাইখ উসামা রহ তখন সেখানে অবস্থান করছিলেন, আর তাঁর সাথে আমিও ছিলাম। কয়েকজন ভাই এসে আমাদের সাথে বসলেন। তখন শাইখ ফিলিস্তিন ও গাজা সম্পর্কে বয়ান করলেন। যেখানে তাদের সাহায্যের কথা বলেছেন। হয়তো এগুলো তাঁর সেই কথাগুলোই; যা তিনি প্রায়ই বলতেন, "হে আমার ফিলিস্তিনের ভাইয়েরা! নিশ্চয় তোমাদের রক্ত আমাদেরই রক্ত। তোমাদের

সন্তানদের রক্ত আমাদের সন্তানদেরই রক্ত। তাই খুনের বদলা খুনই এবং ধ্বংসের বদলা হবে ধ্বংসই।" ফিলিস্তিনের প্রতি শাইখের ভালোবাসা একটি স্বতন্ত্র আলোচনা। আমরা এটা পরে আলোচনা করবো, ইনশা আল্লাহ। তো এই আগত ভাইদের একজন বললেন, আমরা খবরে দেখেছি, ফিলিস্তিনের মহিলারা হাতে পেস্টুন নিয়ে বিক্ষোভ করছে। তাতে লেখা আছে, 'আমরা উসামার ওয়াদা পূরণের অপেক্ষায় আছি।' এ রকম আরো কিছু কথা। শুনে তিনি চুপ রইলেন, কিন্তু ভীষণ প্রভাবিত হলেন। তারপর আমরা ইশার নামাজের প্রস্তুতি নিলাম। নামাজের জন্য প্রশিক্ষণ শিবিরের মসজিদে গেলাম। ৭ : ৫৬ মিনিটে ফরয নামাজের পর শাইখ উসামা রহ. মসজিদের এক কোণে গিয়ে সুন্নাত আদায় করছিলেন; আর আমি তাঁর কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। নামাজের আগে তাঁর শুনা ফিলিস্তিনের খবরটিই ছিল এই কান্নার কারণ! "ফিলিস্তিনের মহিলারা হাতে পেস্টুন নিয়ে বিক্ষোভ করছে। তাতে লেখা আছে, আমরা উসামার ওয়াদা পূরণের অপেক্ষায় আছি।" আমার বিশ্বাস, তিনি তা পূরণ করেছেন। আল্লাহ তাঁর ওপর, আমাদের ওপর, সকল মুসলমানের ওপর তাঁরই রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুক! (আল্লাহুম্মা আমীন)

শাইখ উসামা রহ. এর জীবনের একটি সুন্দরতম দিক হলো, তাঁর সন্তানদের সাথে সম্পর্ক। যিনিই শাইখের কাছে গিয়েছেন; তিনিই তাঁর সন্তানদের মাঝে নম্রতা-ভদ্রতা, উত্তম চরিত্র অবলোকন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর, আমাদের ও সকল মুসলিমদের সন্তানদের হেফাযত করুন। তিনি অত্যন্ত ধনী ছিলেন। তাঁর অনেক ধন-সম্পদ ছিল। তবুও তাঁর সন্তানরা মেহমানদের খেদমত করতো। তাঁদের হাত ধুয়ে দিতো, খাবার এগিয়ে দিতো এবং তাঁদেরকে তাঁদের স্বস্থানে পৌঁছিয়ে দিতো। মানুষের মুখে শুনতাম, মাশাআল্লাহ! কত সুন্দর শিষ্টাচার! যা শাইখ উসামা রহ. নিজ সন্তানদের শিক্ষা দিয়েছেন। সব সময় এদিক সেদিক যাওয়া সত্ত্বেও; তিনি তাঁর

সন্তানদের আদবের প্রতি ও পড়া-লেখার ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। সর্বপ্রথম তিনি এই ব্যাপারে মনযোগী ছিলেন, তাঁর সন্তানরা হাফেযে কুরআন হবে। আমার ধারণা তাদের অনেকেই কুরআনের অনেকাংশ হিফয করেছে। হতে পারে আমার জানা নেই যে, তাদের অনেকেই সম্পূর্ণ কুরআন হিফয করেছে। আল্লাহ যেন সকল মুসলিম সন্তানদেরকে সেই তাওফীক দান করেন। (আল্লাহুম্মা আমীন)

শাইখ রহ. এর তালীম-তায়াল্লুমের পাশাপাশি ব্যক্তিগত আগ্রহ-উদ্দীপনা ছিল অনেক বেশি। যার কিছু আমি فرسان تحت راية النبي এর দ্বিতীয় সংস্করণে উল্লেখ করেছি। সেখানে তাঁর তালীম ও দাওয়াতের প্রতি আগ্রহ পূর্ণাঙ্গরূপে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি তাঁর সন্তানদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য একজন বিশেষ শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছিলেন।

আমার মুসলিম ভাইয়েরা! আমি এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে তাঁর (সেই শিক্ষকের) সামান্য বিবরণ দিবো। তিনি কোনো সাধারণ আলেম ছিলেন না; বরং তৎকালীন শ্রেষ্ঠ উলামাদের মাঝে অন্যতম একজন আলেম ছিলেন। তিনি আরবী ভাষা, কেরাত ও রসমুল মুসহাফ সম্পর্কে খুবই প্রাজ্ঞ ছিলেন। অনেক ভাই এর থেকে উপকার হাসিল করেছে। আমি নিজেও তা থেকে উপকৃত হয়েছি। আমি তাঁর চরিত্রের ওপর আমার কিতাব আত-তাবরিয়ার মধ্যে কিছু আলোচনা করেছি। ইনি শুধুমাত্র একজন শিক্ষকই নন, বরং আল্লাহর রাস্তায় হিজরত ও জিহাদকারী। তিনি উসামা বিন লাদেন রহ. এর মত একজন ঘোড়সাওয়ার ছিলেন। আরবের এক গ্রামে তাঁর ঘোড়াটি ছিল, যা শাইখ উসামা রহ. তাঁর আস্তাবলে নিয়ে এসেছিলেন। এ সম্পর্কে লম্বা ঘটনা আছে। আরবের সেই গ্রামটি খুবই বরকতময়। যা আমি আগে আর কখনো দেখিনি। ইনশা আল্লাহ, তা নিয়ে পরে আলোচনা করবো। সেখানে আমি যেই দিনটি অতিবাহিত করেছি, এমন সুখময় দিন আমি আর কোথাও কাটাইনি। আমরা এই

শিক্ষকের কাছে তাঁর সোহবত নেয়ার জন্য গিয়েছিলাম। তিনি নিজ হাতে আমাদেরকে খাবার পরিবেশন করেছেন। আমরা তাঁকে বলেছিলাম, আপনি আমাদের উস্তায! এটা আপনার জন্য কখনো শোভা পায় না।

আমার মনে পড়ে- আমি যখন উনাকে আরবী ভাষা এবং উলুমুল কুরআন এর দরসের কথা বললাম, তখন তিনি বলেছেন, সর্বপ্রথম আমরা কিতাবুল্লাহর তিলাওয়াত শুদ্ধ করার দ্বারা দরস শুরু করবো। এরপর আমরা আরবী ভাষা নিয়ে আলোচনা করবো। আমি আমার কিতাব আত-তাবরিয়ার মধ্যে এই আলোচনা করেছি, তিনি প্রথমে আমাকে দিয়ে ইলমুত তাজবীদের ওপর মধ্যম স্তরের একটি মুকাদ্দামা লিখিয়েছেন। এরপরই আমরা নাজমে যাজরী পড়তে শুরু করলাম।

মাশাআল্লাহ! তিনি ইলমের সাগর ছিলেন। তিনি আমাদেরকে খুব সুন্দর ও সহজভাবে শিখাতেন। গ্রামের মাসজিদে উনাকে দেখা যেতো, তিনি খুব সহজেই তাজবীদ শিক্ষা দিচ্ছেন। উদাহরণস্বরূপ: ইখফা ও ইদগামের আলোচনায় তিনি কোনো একটা জিনিস হাতে নিয়ে কাপড়ের ভেতর লুকিয়ে বলতেন, দেখো! এটা ইখফা হয়ে গেছে। আবার অন্য একটি জিনিস দেখিয়ে বলতেন, দেখো! এটা ইদগাম হয়ে গেছে। যার কোনো আলামত আর বাকি নেই। এভাবে তিনি সব কিছু বুঝিয়ে দিতেন।

আমি যখন তাঁর সামনে আল-জারিয়ার দরস নিচ্ছিলাম। তখন আমার সাথে কখনো কখনো আবু হাফস ও শাইখ আবু উবায়দা মৌরতানী শহীদ রহ. থাকতেন।

সেই সময়ে মাঝে মাঝে তিনি আমাদের সাথে বেরিয়ে বাজারে আসতেন এবং ফল কিনে দিতেন। তখন আমরা বলতাম, আপনি এটা কি করছেন? উস্তাদ! এটা তো আমাদের দায়িত্ব। তখন তিনি বলতেন, না, এটা তোমার জন্য না। এটা তোমার বেটা মুহাম্মাদের জন্য। এটা ফিরিয়ে দিও না। একবার তিনি আমাকে মাছ কিনে

দিলে আমি বললাম, এটা আমার দায়িত্ব। তিনি বলতেন, না, এটা তোমার না, মুহাম্মাদের জন্যে; ফিরিয়ে দিও না। তিনি ছিলেন এমনি একজন পুণ্যাত্মা আলেম। যিনি শাইখ উসামা রহ. এর সন্তানদেরকে কুরআন পড়াতেন। তাঁর ছাত্রত্বের সৌভাগ্য আমিও হাসিল করেছি। (আলহামদুলিল্লাহ)

পাঠদানকালে তিনি শাইখ উসামা রহ. এর সন্তানদের সাথে রাগ করে কথা বলতেন। একবার তিনি উসামা রহ. এর এক সন্তানকে বললেন, এই ছেলে! তোমার সাথে কথা বলা ঠিক হবে না, কথা হবে তোমার আব্বুর সাথে। তোমার সাথে লাঠির ভাষায় কথা হবে। তারা চুপ করে বসে থাকতো। শিক্ষকের দিকে চোখ তুলে তাকাতো না। তারা ভয় ও নম্রতার কারণে নিজেদের চোখ নামিয়ে রাখতো। কারণ, তারা তাদের আব্বুর কাছে উত্তম আদবের শিক্ষাই পেয়েছে। মাঝে মাঝে তিনি মসজিদে ইসলামে বাচ্চাদের শিষ্টাচারের পাঠ শিক্ষা দিতেন এবং এই আলোচনার ওপর তারবিয়াতুল আবনা ফিল ইসলাম নামের কিতাব মুতালা‘আ করতেন। (সেই শিক্ষকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ হলো)

আমি জানি শাইখের সন্তানরা তাঁর ব্যক্তিত্বের সাথে সর্বক্ষেত্রেই সম্পর্ক ও মিল রাখে। খুব কাছ থেকেই আমি তা দেখেছি। শাইখের পাশে তাঁর সন্তানরা এমনভাবে ঘিরে থাকতো, যেভাবে সিংহকে সিংহ শাবকরা ঘিরে থাকে। ইনশাআল্লাহ! এমন কিছু স্মৃতিকথা নিয়ে পরে আলোচনা হবে। শাইখের স্মৃতি তো অনেক রয়েছে। আজ শাইখ ও তাঁর সন্তানদের মাঝের স্মৃতিময় দু’টি ঘটনা নিয়ে আলোচনা করবো।

**ঘটনা-১.** প্রথম ঘটনাটি ঘটেছিল জালালাবাদে। যখন মুনাফিকরা জালালাবাদ দখল শুরু করল। তখন আমরা তোরাবোরা পাহাড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। শাইখ উসামা রহ. এর সাথে তাঁর আদরের ছোট তিন বাচ্চা ছিল। তাদের একজন হলেন খালেদ (রহ.)। যিনি শাইখের সাথেই শাহাদাতের সুমিষ্ট স্বাদ আস্বাদন করেছিলেন। তাঁর

সন্তানদের মাঝে খালেদই ছিল তুলনামূলক বড়। আমরা ওখান থেকে বের হয়ে তোরাবোরায় মাগরিব পড়ার ইচ্ছে করলাম। আসর ও মাগরিবের মাঝামাঝি সময়; এক সাথী শাইখের বাচ্চাদের নিয়ে এলেন। তারা আপন পিতাকে সালাম করল। শাইখ ঐ ভাইকে দায়িত্ব দিলেন, যেন প্রথমে বাচ্চাদেরকে কোন নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তাদেরকে নিজ পরিবারের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। আমি দূর থেকে এ দৃশ্যই দেখছিলাম, একজন পিতা নিজের ছোট তিন বাচ্চাকে আল-বিদা বলছে! তাঁর জানা নেই, পুনরায় কবে আবার তাদের সাথে সাক্ষাৎ হবে? এই দুনিয়ায় কি সাক্ষাৎ হবে? আর না জানা আছে এ কি প্রথম বিদায়; না শেষ বিদায়?! আমি শাইখকে বিদায় দিতে দেখেছি। দেখেছি সালামের পর তিনি তাঁদের বুঝাচ্ছেন, তোমরা এই চাচ্চুর সাথে যাও; তিনি তোমাদেরকে ঘরে পৌঁছিয়ে দিবেন। বড় ছেলেটির চোখে অশ্রু ঝরঝর করছিল। শাইখ নিজেও ছিলেন আবেগাপ্লুত। শাইখের ছোট ছেলে বলল “আব্বু! আমি কাবুলে ব্যাগ ফেলে এসেছি। আমি ব্যাগ কোথায় পাবো?” তাঁকে কে বুঝাবে? কাবুল তখন শত্রুদের দখলে। শাইখ বললেন “কোন সমস্যা নেই আব্বু! তোমার চাচ্চু ব্যাগ এনে দিবেন।” তারপর তাঁরা আলাদা হয়ে গেল। খুবই করুণ ছিল সেই দৃশ্য। পিতা ও তাঁর ছেলেরা আলাদা হয়ে যাচ্ছেন। অথচ কেউ জানে না, আবার কবে, কখন, কোথায়, কিভাবে তাদের সাক্ষাৎ হবে?!

**ঘটনা-২.** এমনি আরেকটি ঘটনা। যার ফলে আমার অন্তরে তাঁর ভালবাসা গেঁথে গেছে। এটি ঐ সময়ের কথা; যখন আমরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবর্তন হচ্ছিলাম। তাঁর কোনো এক সন্তান আমাদের সাথে ছিল। আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করে রাতের আঁধারে গাড়িতে আরোহণ করলাম। এক জায়গায় গাড়ি থামল। সেখানে শাইখের সন্তানকে তাঁর রাহবারের সাথে নিচে নামানো হলো। তাঁরা ও আমরা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি। তাকে বিদায় দেয়ার জন্য শাইখ নিচে নামলেন।

তারা কেউ জানে না, দ্বিতীয় বার দেখা হবে কিনা? আমরা দেখছিলাম, এই মুহূর্তে তিনি তাঁর সন্তানকে কী বলেন? তিনি বলেছিলেন, বেটা! শপথ কর, "জিহাদের রাস্তা কখনও ছাড়বে না।" এই মুহূর্তটি আমি কখনও ভুলবো না।

আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দিলে পুনরায় শাইখ উসামা বিন লাদেন (রহ.) এর জীবনীর উপর আলোচনা করবো।

# পর্ব ২

মুজাদ্দিদ ইমাম ও বীর মুজাহিদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর সাথে কাটানো স্মৃতিগুলো নিয়ে আজকে আলোচনার দ্বিতীয় পর্ব। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের সকলকে শাইখের সাথে তাঁর রহমতের ছায়াতলে একত্রিত করেন। পূর্বের সাক্ষাৎকারে আমি এই বিষয়টি উল্লেখ করেছিলাম, মুহসিনে উম্মত শাইখ উসামা রহ. এর স্মৃতিগুলো নিয়ে আলোচনার এই পর্বগুলো হবে একটু ভিন্ন ধরনের। শাইখের সান্নিধ্যে অবস্থানকারীগণ খুব ভালোভাবেই অবগত আছেন যে, শাইখ উসামা রহ. এর ব্যক্তিত্বের একটি আদর্শিক দিক হচ্ছে: তিনি তানযীম ও সাংগঠনিক গোঁড়ামি থেকে একেবারেই মুক্ত ছিলেন। এমন লোক খুব কমই হয়ে থাকে, যারা সাংগঠনিক গোঁড়ামি থেকে মুক্ত থাকেন। শাইখ উসামা রহ. সেই কম লোকদেরই একজন ছিলেন। আমার স্মরণ আছে, জালালাবাদকে বিজয়ের অপারেশন ও আক্রমণের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যখন আমি শাইখের নিকট পৌঁছলাম; তখন সব সংগঠনের ভাইদেরকে শাইখের পাশে একত্রিত অবস্থায় দেখলাম। ইখওয়ান, জামা'আতুল জিহাদ আরব-অনারব, ইরাকের, এমনকি সকল মুজাহিদ সাথীরা শাইখকে ঘিরে একত্রিত হয়েছিল। এই অবস্থা দেখে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে

গেলাম। তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই কথা বলে উঠলাম, মাশাআল্লাহ! হে উসামা বিন লাদেন কতই না সৌভাগ্য আপনার! আপনি সকলকে এই জিহাদের মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ওপর এবং এই কল্যাণকর কাজের ওপর একত্রিত করে ফেলেছেন। শাইখ উসামা রহ. এর আরেকটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, সে কোন সংগঠনের লোক বা কোন তানযীমের লোক, তিনি এদিকে খেয়াল করতেন না; শাইখ মুসলিমদের কল্যাণের জন্য প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির সাথেই পরামর্শ করতেন। এমনকি তিনি অন্য সংগঠনের ভাইদেরকে নিজের কাজে ব্যবহার করতেন এবং স্বতন্ত্র দায়িত্বে নিয়োজিত রাখতেন। কারো মাঝে যদি কোনো যোগ্যতা দেখতেন; তাহলে তার থেকে পরিপূর্ণ ফায়দা নেয়ার চেষ্টা করতেন এবং তাকে যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে লাগিয়ে রাখতেন।

শাইখ উসামা রহ. এর উস্তাদ শাইখ উমর আব্দুর রহমান রহ. এর মুক্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টার ঘটনাটিই এর প্রমাণ। তিনি সাংগঠনিক গোঁড়ামি থেকে পরিপূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন। শাইখ উমর আব্দুর রহমান রহ. এর মুক্তির জন্য যখন প্রচেষ্টা চলছিল; তখন আমি খুব কাছ থেকেই এ বিষয়টি লক্ষ্য করেছি। কয়েকবার তিনি এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন। এমনকি শুধুমাত্র এই বিষয়ের জন্যই একটি বিশেষ কনফারেন্সের আয়োজন করেছিলেন। যেখানে বিভিন্ন সংগঠনের ভাইয়েরা আলোচনা করেছিল। শাইখ উসামা রহ. যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক ভাইয়ের সাথেই শাইখ উমর আব্দুর রহমান রহ. এর মুক্তির ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। এই কনফারেন্সের উপস্থিত সকলেই এই ব্যাপারে সাক্ষী; যারা হয়তো এখন আমার আলোচনাও শুনছেন। একবার, শাইখ উমর আব্দুর রহমান রহ. এর মুক্তির জন্য চেষ্টা করছিলেন; এমন কয়েকজন ভাই বললেন, আমরা শাইখ উসামার সাথে এই ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য কথা বলবো। আমি তাদের নিয়ে শাইখের নিকট

পৌঁছলাম; তখন তিনি জালালাবাদের নিকটাবর্তী একটি উপত্যকায় অবস্থান করছিলেন। যেখানে চারপাশেই ছিল মুজাহিদীনদের ঘাঁটি। পাহাড়ের পাশ দিয়ে খুব সুন্দর নদী প্রবাহিত হচ্ছিল। দৃশ্যটা ছিল খুবই মনোরম। এটা ঐ স্থান; যেখানে বসে শাইখ সেই ঐতিহাসিক শপথ বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, "আমেরিকা ততক্ষণ পর্যন্ত নিরাপত্তা লাভ করবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা ফিলিস্তিনে নিরাপত্তা লাভ করি।" অতঃপর আমি সেখানে পৌঁছে শাইখ আবু হাফস রহ. ও শাইখ উসামা রহ. এর সাথে এই বিষয়ে আলোচনা করলাম। শাইখ উসামা রহ. বলে উঠলেন, আমি তো এই বিষয়ের জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত। আপনি এই ভাইদের কাছে জিজ্ঞাসা করুন, যদি আমার এই বিষয়ে চেষ্টার ক্ষেত্রে কোনো অপূর্ণতা থেকে থাকে; তাহলে আমি সেটা পূর্ণ করার জন্য প্রস্তুত আছি। অতঃপর আমি সেই ভাইদের বললাম, শাইখ তো এই কথা বলছেন; তখন তারা বললেন, না আমরা এই কথা বলছি না যে, শাইখ কোনো অপূর্ণাঙ্গতা রেখেছেন। বরং আমরা তো এই ব্যাপারে শাইখকে সহযোগিতা করতে চাই।

আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে আমরা মুসলিম বন্দীদের মুক্তি করার জন্য, বিশেষকরে শাইখ উমর আব্দুর রহমানকে মুক্ত করার জন্য আমেরিকান ইয়াহুদী ওয়ার্ন আইনিষ্টাইনকে বন্দী করতে সক্ষম হয়েছি। তার মুক্তির জন্য যে শর্তগুলো রেখেছি, তার মাঝে একটি উল্লেখযোগ্য শর্ত হলো: শাইখ উমর আব্দুর রহমান রহ. কে মুক্তি দেওয়া এবং তাঁর পরিবারের নিকট তাঁকে সহীহ সালামাতে পৌঁছে দেয়া। বাকি শর্তগুলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য কিছু শর্ত হলো: বোন আফিয়া সিদ্দীকাকে মুক্তি দেওয়া এবং শাইখ আবু হামজা মুহাজিরসহ ঐ সকল বন্দীদের মুক্তি দেওয়া; যাদেরকে আল-কায়েদার সাথে সম্পৃক্ততার কারণে বন্দী করা হয়েছে। যার সাথে আরো অনেক শর্ত রয়েছে, আপনারা বিস্তারিত আমার ভিডিওতে দেখতে পারেন। আল্লাহ

তা'আলার কাছে দুআ করছি- তিনি যেন শাইখ উমর আব্দুর রহমানের মুক্তিকে ত্বরান্বিত করেন এবং বাকি সকল মুসলিমকেও মুক্তির নেয়ামত দান করেন।

আমার ইচ্ছা আছে, আমি শাইখের আরো কিছু মহান আদর্শ নিয়ে আলোচনা করবো। শাইখ উসামা রহ. খুবই যাহেদ তথা দুনিয়াবিমুখ ছিলেন। বাস্তবতা হচ্ছে, শাইখ উসামা রহ. এর যুহদ তথা দুনিয়াবিমুখতার ব্যাপারটি কারো অজানা নয়। সবার জানা আছে, আরবের এই কোটিপতি ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিজের সমস্ত সম্পদ আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় খরচ করে দিয়েছেন। কিন্তু এখানে আমি শাইখের অতিবাহিত জীবন-যাপনের মাঝ থেকে কিছু দুনিয়াবিমুখতার উদাহরণ আপনাদের সামনে পেশ করবো।

শাইখ উসামা রহ. এর ঘরে যখন কেউ প্রবেশ করতেন; তখন তাঁর ঘরের অবস্থা দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে যেতেন! তাঁর ঘরে কাঠের কিছু চেয়ার, প্লাস্টিকের কিছু চাটাই ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। অর্থাৎ একেবারেই মাল-সামানাবিহীন একটা অবস্থা। শাইখ যখনই আমাদেরকে নিজের ঘরে খাবার খেতে ডাকতেন, তখন তার ঘরে যা উপস্থিত থাকতো; তাই সামনে পরিবেশন করতেন। রুটি, সবজি আবার কখনো ভাতও। শাইখের ইচ্ছা হলো: মুজাহিদীনরা যাতে আরাম-আয়েশের, ভোগ-বিলাসের জীবন থেকে একেবারেই দূরে থাকে। এমনকি যখন আমরা করয়াতুল আরবের মধ্যে ছিলাম; আল্লাহ তা'আলা যেন এই বরকতময় বসতি এবং দখলকৃত সমস্ত মুসলিম ভূখণ্ডকে মুসলিমদের হাতে আবারো ফিরিয়ে দেন। তখন শাইখ অধিকাংশ সময়ই ভাইদেরকে এই ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন, যাতে করে তারা নিজের ঘরে বিদ্যুতের ব্যবস্থা না করে এবং বিদ্যুৎ ছাড়াই থাকার অভ্যাস করে। আবার মাঝে মাঝে এ ব্যাপারে খুব কঠোরতাও দেখাতেন। আমি মাঝে মাঝে শাইখের সাথে কিছু বিতর্ক করতাম যে, এই কঠোরতার কারণ কি? তিনি বলতেন, 'যাতে

মুজাহিদীনরা এই ভোগ বিলাসের জীবনকে জিহাদের শত্রু মনে করে। এবং যে দিন তাদের প্রশিক্ষণ কঠিন পরিস্থিতিতে হবে, তখন তারা জিহাদের কষ্টকে খুব সহজভাবে মেনে নিতে পারবে। এবং কোনো কঠিন পরিস্থিতিই তাদেরকে জিহাদ থেকে দূরে সরাতে পারবে না।' জিহাদের প্রশিক্ষণের প্রতি শাইখের খুব গভীর দৃষ্টি ছিল।

আমি একটি বিষয় আলোচনা করতে ভুলেই গিয়েছিলাম, শাইখের এই দুনিয়াবিমুখতার পরও তিনি মেহমানদের আপ্যায়ন করানোর ক্ষেত্রে খুবই প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁদের জন্য পশু জবাই করতেন এবং খুব ভালো খাবার পরিবেশন করতেন। এমনিভাবে মানুষ যখন কান্দাহারে অনেক ভিড় করছিল, দুই-একদিন পর পর দশ-বিশজনের একেকটি প্রতিনিধি দল শাইখের সাথে সাক্ষাত করতে আসতেন; তখন শাইখ মেহমানদের আধিক্যতার কারণে একপাল বকরী ক্রয় করেছিলেন। যাতে তাঁদের মেহমানদারিতে কোনো ধরনের ত্রুটি না হয়। এভাবেই দিন দিন যখন মেহমান আরো বাড়তে লাগলো, তখন শাইখ সেখানে একটি মেহমানখানাও নির্মাণ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা যেন কান্দাহারের পবিত্র ভূমিকে আবারো মুসলিমদের হাতে ফিরিয়ে দেন।

সাধারণ সাথী, যারা বাইরের সাধারণ বিভাগে থাকতেন, তাদের খাবারের ব্যবস্থা সাধারণ বডিং থেকেই করা হতো। যেখানে রুটি, ডাল, সবজি ব্যতীত অন্য কিছু পাওয়া দুঃসাধ্যের ব্যাপার ছিল। যখনই বাহির থেকে কোনো মেহমান শাইখের সাথে সাক্ষাত করতে আসতেন, তখন তারাও আনন্দিত হয়ে যেতেন এবং বলতেন, চলো, আজকে খাবারে নতুন কিছুর ব্যবস্থা হবে, গোশত অথবা অন্য কিছু। এভাবে শাইখ রহ. এত সাধাসিধে জীবন-যাপন করার পরেও যখন তিনি কোনো জিহাদী সফরে বের হতেন, তখন শাইখের সাথে থাকা সাথীদের জন্য অনেক বেশি খরচ করতেন।

এখানে জিহাদী সফরের কথা বলা হচ্ছে; আর জিহাদী সফর ব্যতীত শাইখের অন্য কোনো সফর তো ছিলই না। আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁর এই সকল কষ্টকে কবুল করেন। এই অধিক খরচ করার কারণে আমি শাইখকে একবার বললাম, শাইখ এটা কি প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত খরচ নয়? তো শাইখ বললেন, তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও। কারণ আমার সাথে যারা থাকে, তাদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়; তাদের জীবনের সময় খুবই সংকীর্ণ এবং তাদের অধিকাংশই অন্যান্য কাজের সুযোগ পায় না; এমনকি তাদেরকে সবসময়ই অভিযানের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। কারণ কখনো শাইখ আসছেন, আবার কখনো যাচ্ছেন। আবার কখনো সফরে বের হচ্ছেন, তো এই সাথীরা সব সময়ই ছায়ার মত শাইখের পাশে থাকছেন। এ জন্যই শাইখ এদের ব্যাপারে বলতেন, তাদেরকে একটু আলাদাভাবে দেখা দরকার। এটি হচ্ছে শাইখের উত্তম আদর্শের একটি দৃষ্টান্ত।

অনুরূপভাবে শাইখের নিরাপত্তা কর্মীদের সাথেও শাইখের এক আশ্চর্যজনক সম্পর্ক ছিল। নিরাপত্তার জন্য নির্ধারিত এ সব সাথীরা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই এ কাজ করতেন। এ ধরনের লোকের ঋণ কোনোভাবেই শোধ করা সম্ভব নয়। কারণ তারা নিজেদের জান, নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে শাইখের নিরাপত্তার জন্য ব্যস্ত থাকতেন। এমনিভাবে তারা শাইখকে হেফাজত করার জন্য আল্লাহর কাছেই সওয়াবের আশা করতেন।

শাইখ উসামা রহ. কে হেফাজত করার ব্যাপারে ঐ সব সাথীদের আত্মোৎসর্গের একটি ঘটনা আমার স্বরণ আছে, আফগানিস্তানে ক্রুসেড যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর শাইখ বিভিন্ন জিহাদের ঘাঁটিতে অবস্থান করছিলেন। সে সময় আমিও শাইখের সাথে ছিলাম। এভাবেই যখন আমরা জালালাবাদে পৌঁছলাম, তখন আফগানিস্তানে ব্যাপক বোম্বিং শুরু হলো। রাত হতে না হতেই বোমা বর্ষণের ধারাবাহিকতা জালালাবাদ

এবং তার আশপাশের এলাকায়ও পৌঁছে গেল। আমাদের মনে এই আশংকা হচ্ছিল, অচিরেই এই বোমাবর্ষণ আমাদেরকেও ছেঁয়ে ফেলবে। আমরা তো জলদি করেই সেখান থেকে সরে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। আমরা যেই ঘরে ছিলাম; তার সামনের দিকে একটি বাগান এবং পিছন দিকে কিছু কামরা ছিল। ঐ সময় আমার যা বুঝে আসছিল, সেই অনুযায়ী আমি পিছনের দিকের কামরাগুলোকেই আশ্রয়স্থল বানালাম। কিন্তু শাইখকে শাইখের নিরাপত্তাকর্মীরা সামনের দিকে বাগানে নিয়ে গেল। বাগানের মাঝে এমন কিছুই পেলেন না; যার আড়ালে তারা অবস্থান করতে পারবে। তাই তারা শাইখকে একটি দেয়ালের পাশে বসিয়ে দিলেন এবং তারা শাইখের সামনে নিজেদেরকে একটি সীসাঢালা প্রাচীরে পরিণত করলেন। তারা শাইখকে আড়াল করে রাখলেন, যদি আঘাত লাগেই; তাহলে যেন তাদের গায়ে লাগে আর শাইখ নিরাপদে থাকেন। এই হলো শাইখ এবং তাঁর হিফাজতকারীদের/প্রহরীদের গভীর সম্পর্কের একটি দৃষ্টান্ত।

অনুরূপভাবে শাইখ খুবই দানশীল ছিলেন। আল্লাহর রাস্তায় খরচের ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো: তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ফি সাবীলিল্লাহর জন্য খরচ করে দিয়েছেন। আমার একটি ধারণা, আল্লাহ তা‘আলা শাইখকে দুনিয়াতে সম্মানিত করেছেন এবং আশা করি, জান্নাতেও তিনি তাঁকে সম্মানিত করবেন। তো এর একটি বড় কারণ হলো: তাঁর সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে দেয়া। একবার আমি শাইখ আবু হাফস রহ. কে জিজ্ঞাস করলাম, এমন কোন বিষয় রয়েছে, যার জন্য আল্লাহ তা‘আলা মানুষের অন্তরে শাইখ উসামা রহ. এর প্রতি এত ভালবাসা এবং সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন?

এই ব্যাপারে শাইখ আবু হাফস রহ.ও এই কথা বলেছিলেন, আমার ধারণা অনুযায়ী এর কারণ হলো: তাঁর সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে দেয়া। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আপনার কথা একেবারেই সত্য।

শাইখ রহ. দানের ব্যাপারে ছিলেন একেবারেই উদার। সাথে সাথে তিনি আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসাও করতেন। তিনি খরচ করতে থাকতেন এবং পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলার থেকে রিজিকের আশা করতেন। আর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রিজিকের ব্যবস্থাও করে দেওয়া হতো।

অধিকাংশ মানুষই এটা মনে করেন যে, শাইখ উসামা রহ. আরবের কোটিপতি হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কোটিপতি থাকা অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করেছেন। আবার কোটিপতি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। তবে বাস্তবতা হলো: শাইখ উসামা রহ. যখন সুদান থেকে বের হলেন, তখন তাঁর অনেক সম্পদ লোকসান হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা যেন সুদানের হুকুমতকে হিদায়াত দান করেন; যারা শাইখ উসামা রহ. এর অর্থ দিয়ে উপকৃত হয়ে শাইখ উসামা রহ. এর সহযোগিতার ক্ষেত্রে হাত গুটিয়ে নিয়েছিল। এটা ভিন্ন কথা, আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীতে মুজাহিদীন ও তালেবানদের মাধ্যমে শাইখকে সাহায্য করেছেন। সুদানের বিষয়ে সময় হলে আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ। আসল কথা হলো: শাইখ যখন সুদান থেকে বের হলেন, তখন তাঁর সম্পদের অবস্থা এত ভালো ছিল না, মানুষ যেরূপ ধারণা করে থাকে। তবে এটা সত্য, শাইখ তখনো সম্পদের মালিক ছিলেন। এতদসত্ত্বেও কখনোই শাইখ জিহাদের ক্ষেত্রে সম্পদ খরচ করতে কৃপণতা করেননি। যার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ হলো, শাইখের নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটন আক্রমণের বিশাল খরচ। ৯/১১ হামলার ব্যাপারে এখানে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরবো, আমেরিকা এবং তার দোসর আরব-অনারবের মিডিয়াগুলোর একটি নিকৃষ্ট চরিত্র হলো: যখন ৯/১১ এর হামলার

আলোচনা আসে, তখন তারা শুধুমাত্র নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, তথা টুইন টাওয়ারের আলোচনা করেই ক্ষান্ত হয়ে যায়। পেন্টাগন ও ঐ জাহাজের কথা আলোচনা করা হয় না; যা সেলভিনিয়ায় ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এই সকল লোকেরা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এর আলোচনা তো করে; কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে পরাশক্তির অধিকারীদের মাথায় আঘাতের বিষয়গুলোও উল্লেখ করে না। এমনিভাবে যখন ৯/১১ এর হামলার দিন আসে, তখন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ধ্বংস্তুপের নিকট গিয়ে কিছু অশ্রু বিসর্জন দিয়ে থাকে এবং এই চেষ্টা করতে থাকে যে, কিভাবে মুজাহিদীনদেরকে হিংস্র ও খুনী সাব্যস্ত করা যায়। পাশাপাশি এটাও বুঝানোর চেষ্টা করে যে, আমেরিকা এতই পূত-পবিত্র! তারা কোনো অপরাধ-ই করেনি। তবে বাস্তবতা হলো: এরাই হচ্ছে তারা; যারা জাপানে পরমাণুবিক বোমা দিয়ে জাপানকে ধ্বংস করে দিয়েছে। কিন্তু সুবহানাআল্লাহ! এত কিছু করার পরেও তারা একেবারেই মাসুম ও নির্দোষ!

সারকথা হলো: শাইখ জিহাদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি খরচ করতেন। এই ব্যাপারে শাইখ আমাকে একবার একটি ঘটনা শুনিয়েছিলেন। একবার শাইখের নিকট খুব সামান্য কিছু পয়সা ছিল, ঐ সময় ৯/১১ এর হামলার প্রশিক্ষণের জন্য নিযুক্ত এক ভাই আসেন এবং বলেন আমার খুব শীঘ্রই এত টাকা প্রয়োজন। যদি এই টাকার ব্যবস্থা হয়, তাহলে সাথীদেরকে পরিপূর্ণরূপে গড়ে তুলতে পারবো। শাইখ রহ. বললেন, আমার কাছে শুধুমাত্র আগামী মাস চলার মতো খরচ আছে; যাও! তুমি এগুলো নিয়ে যাও। আল্লাহ তা'আলা হয়তো আমাকে অন্য জায়গা থেকে ব্যবস্থা করে দিবেন। আসলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ব্যবস্থা করেও দিয়েছিলেন। একবার এক ভাই আমাকে একটি ঘটনা বলেছিলেন, সে এই ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন। একবার আমেরিকান এম্বেসিতে আক্রমণের জন্য নির্ধারিত এক জিম্মাদার সাথী

শাইখের কাছে এসে বললেন, আমাদের পঞ্চাশ হাজার ডলার খুব শীঘ্রই প্রয়োজন; ঐ সময় শাইখের কাছে শুধুমাত্র পঞ্চান্ন হাজার ডলার ছিল। শাইখ ঐ ভাইদেরকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দিয়ে দিলেন এবং বলতে লাগলেন আমার কখনো অতিরিক্ত সম্পদের জন্য এত আনন্দ লাগেনি; যতটুকু আনন্দ আজকের এই অতিরিক্ত পাঁচ হাজার ডলারের জন্য লাগছে। আজকে আমার এ জন্য আনন্দ লাগছে, আমি আমার সম্পদের অধিকাংশ সম্পদই জিহাদের জন্য খরচ করে দিয়েছি। আসলে জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহর জন্য শাইখের খরচের ব্যাপারটি একটি প্রসিদ্ধ বিষয়; যা সকলেই জানি।

এখানে আমি সামান্য কিছুই আলোচনা করতে পারবো। শাইখের জিহাদের জন্য খরচের ব্যাপারে আরেকটি বিষয় আলোচনা করা দরকার। সকলেই জানেন যে, শাইখ রহ. জিহাদের ক্ষেত্রে ব্যয় করার ব্যাপারে বড়ই প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু অনেকলোকই এই কথার ওপর অবগত নয় যে, শাইখ রহ. আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে জিহাদের জন্য সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে খুবই সতর্কভাবে খরচ করতেন। [আমাদের আর কত সময় বাকি আছে ভিডিও ধারণ করার? ভিডিও ধারণকারী ভাইদেরকে খুবই পেরেশান দেখা যাচ্ছে!] তো আমি এই কথা বলছিলাম, শাইখ অন্যান্য ব্যাপারে সম্পদ খরচ করার ক্ষেত্রে খুবই কঠোর ছিলেন। এই ব্যাপারে আমার এক সাথীর ঘটনা স্মরণ আছে, যখন আমরা রুশদের বিরুদ্ধে জিহাদের সময় পেশওয়ারে অবস্থান করছিলাম; ঐ সময় আমার এক পরিচিত ভাই সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। ঐ ভাই, যার সাথে আমার এবং শাইখ আবু উবাইদা রহ. এর সম্পর্ক ছিল। তার ওপর মুজাহিদীনদের তা'লীম তারবিয়াতসহ বিভিন্ন বিষয়ের জিম্মাদারি ছিল। ঐ ভাইয়ের এমন একটি মাদরাসা করার ইচ্ছা ছিল, যেখানে উত্তম শিক্ষা দেওয়া হবে। এমন আলেম-উলামা তৈরী হবে; যারা সব ধরনের ভালো কাজে

অংশগ্রহণ করবে। সে ছিল এই ব্যাপারে খুবই আগ্রহী । সে আমার এবং শাইখ আবু উবাইদার নিকট এসে বলল, আপনি আমার এই ইচ্ছার ব্যাপারে শাইখ উসামা রহ. এর সাথে আলোচনা করবেন আর আমাকে একটু সহযোগিতা করবেন। আমি বললাম, না, আমি এই ধরনের কাজ পূর্বে কখনো করিনি; আর এটা আমার অভ্যাসও নয় যে, আমি কাউকে শাইখের নিকট নিয়ে যাবো এবং বলবো শাইখ তাকে সহযোগিতা করুন। আমি এটা করতে পারবো না। তখন সে বলতে লাগল, তাহলে আপনি আমাকে একটু শাইখের সাথে আলোচনা করার ব্যবস্থা করে দিন। তখন আমি বললাম, আচ্ছা ঠিক আছে; চলো, শাইখের সাথে সাক্ষাত করিয়ে দেই। অতঃপর ঐ ভাই শাইখের সাথে বসলেন এবং নিরিবিলি আলোচনা শুরু করলেন, আর শাইখ সবগুলো কথাই গুরুত্ব সহকারে শুনলেন। অতঃপর যখন সে ভাই তার ইচ্ছার কথা শাইখকে জানালেন এবং বললেন, আমি চাই এই ব্যাপারে আপনি আমাকে কিছু সাহায্য সহযোগিতা করুন। শাইখ বললেন, না, আমি সাহায্য করতে পারবো না। এই কথা শুনে ঐ ভাই খুব পেরেশান হয়ে গেলেন এবং বলতে লাগলেন, এর কারণ কি? এটা কি কোনো ভালো কাজ নয়? এতে কি মানুষের উপকার হবে না? মুজাহিদীনরাও এর দ্বারা উপকৃত হবে। ঐ সময় শাইখ বললেন, “আমার প্রিয় ভাই! আজকে জিহাদকে নিয়ে চিন্তা করার মতো কোনো লোক নেই। কিন্তু এই ধরনের এতিমদের ওপর এবং মাদ্রাসার ওপর খরচ করার বহু লোক রয়েছে। আর জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ যদি ঠিকভাবে হয়; তাহলে এ ধরনের সব সমস্যা দূর হয়ে যাবে। সুতরাং আজকে জিহাদে সম্পদ খরচের মতো কোনো লোক নেই; এই পরিস্থিতিতে আমি জিহাদের সম্পদ আপনাকে দিয়ে দিবো! এটা হতেই পারে না।” তখন ঐ ভাই অনেক আফসোস ও পরিতাপ করতে লাগলেন। কিন্তু তার চিন্তাধারা আগের মতোই রয়ে গেল এবং শাইখের সাথে তর্ক করতে লাগলেন; কিন্তু শাইখ

নিজের মতের ওপর অটল রইলেন। এই পরিস্থিতিতে আমার সন্দেহ হচ্ছিল, শাইখ এটা মনে করে বসেন কিনা, আমি এবং আবু উবাইদা ঐ ভাইয়ের রায়ের সাথে একমত। তাই আমি বলে উঠলাম, ভাই! শাইখ যে কথা বলেছেন, সেটাই সঠিক। আর সম্পদ খরচের ক্ষেত্রে এখন জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহই বেশি হকদার। যখন এটা পূর্ণাঙ্গ হয়ে যাবে, তখন অন্য জায়গায় খরচ করা হবে। ঐ সময় ঐ ভাই আরো নৈরাশ হলেন এবং বললেন, শাইখ! আপনি যদি আমাকে সাহায্য করতে না পারেন; তাহলে এমন কারো সাথে আমার সাক্ষাৎ করিয়ে দিন, যারা এই ব্যাপারে সাহায্য করবে। তখন শাইখ আবারো বললেন, আমি এটাও করতে পারবো না। ঐ ব্যক্তি বললেন, সুবহানাল্লাহ! এটার মাঝে আবার কি সমস্যা? শাইখ বললেন, “এটা কিভাবে সম্ভব! একদিকে আমি এ কথা বলবো, এখন ব্যয় করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো: জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ, আবার আমি অপরদিকে অন্য জিনিসের জন্য টাকা চাইবো? এটা করলে তো কথা ও কাজে কোনো মিল থাকলো না।” অতঃপর ঐ ভাই খুব বেশি নৈরাশ হলেন এবং শাইখের থেকে এ ব্যাপারে কোনো ধরনের ফায়দাই হাসিল করতে পারলেন না।

শাইখের আদর্শিক আরেকটি দিক এটাও ছিল যে, শাইখ লেনদেনের ক্ষেত্রে অনেক সময় নিজের হক্ব মাফ করে দিতেন। এই ব্যাপারে আমার একটি ঘটনা স্মরণ আছে, আমাদের এক ভাই যিনি রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন; অতঃপর শাইখ যখন সুদানে চলে যান এবং সেখানে বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করলেন; তখন সেই ভাই শাইখের নিকট গেলেন। আর শাইখেরও ঐ ভাইয়ের প্রতি অনেক আত্মবিশ্বাস ছিল। তখন সেই ভাই শাইখকে বলল, শাইখ আমি মানুষের কাছ থেকে টাকা পয়সা নিয়ে ব্যবসা করে থাকি; এর মাধ্যমে লাভ করে নিজেও উপকৃত হই এবং মানুষদেরকেও উপকৃত করি। তখন শাইখ বললেন, এটা তো খুব ভালো কথা। তখন সে বলল,

আমি চাই আপনিও আমাকে কিছু সাহায্য করুন। শাইখ বললেন, ঠিক আছে, আপনাকে সাহায্য করবো কিন্তু একটি শর্ত আছে। সে বলল, শর্তটি কি? শাইখ বললেন, যে জিনিস আমি আপনাকে দিবো, সেটা আমার অনুমতি ব্যতীত বিক্রি করতে পারবেন না। উনি বললেন, ঠিক আছে আপনার শর্ত আমি মেনে চলবো। অতঃপর শাইখ একটি কাগজে সাইন করতে দিলেন এবং শাইখের গোডাউন থেকে অনেক পরিমাণ চিনি নিয়ে যেতে বললেন। শাইখ সুদানে ব্যবসা করতেন; এর মধ্যে চিনির ব্যবসাও ছিল। তিনি সুদানের কারখানা থেকে চিনি ক্রয় করে পাইকারি বিক্রি করতেন। শাইখ ঐ ভাইকে দশ হাজার ডলার সমপরিমাণ টাকার চিনি দেওয়ার জন্য এজাজতনামা লিখে দিলেন এবং বললেন এটা আপনাকে আমি ঋণ দিলাম। আপনি এটা বিক্রির মাধ্যমে হালাল রিজিক কামাই করবেন এবং যখন এর মূল্য একত্রিত হবে, তখন আমার ঋণ পরিশোধ করে দিবেন। কিন্তু এই শর্তটি রক্ষা করবেন, যা আপনাকে দিয়েছি। অতঃপর সে বলল, ইনশাআল্লাহ, আমি তা মেনে চলবো। সে চিনি নিয়ে চলে গেল এবং বিক্রি করতে শুরু করল। কিন্তু এই ভাই মনে হয় ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে খুব বেশি অভিজ্ঞ ছিলেন না। কিছুদিন পর তার নিকট লম্বা দাড়ি, লম্বা জামা পরিধানকারী এক ধোঁকাবাজদের লিডার আসলো। যে ছিল প্রসিদ্ধ ধোঁকাবাজ জামালুল ফজল। সে শাইখ উসামা রহ. এর প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতো। পরবর্তীতে টাকা-পয়সা আত্মসাৎ করে বহিস্কৃত হয় এবং সে সাধারণ মানুষদের অনেক টাকা-পয়সা আত্মসাৎ করেছে। অবশেষে সে নিজেকে মানুষের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আমেরিকার সাথে একত্রিত হয় এবং শাইখের ব্যাপারে ইনফরমেশন দিয়ে আমেরিকা থেকে টাকা উপার্জন করতে শুরু করে। যেহেতু এই জামালুল ফজল (আগে) শাইখের সাথে থাকতো; এজন্য ঐ ভাইও তার ওপর বিশ্বাস করে বসে এবং সে ঐ ভাইকে বলে, আমি তোমাকে পস্ত ভাইদের সাথে যোগাযোগ

করিয়ে দিবো। যে তোমাকে সবচেয়ে বেশি মূল্য দিবে এবং তোমার থেকে চিনি নিয়ে তোমাকে পয়সা দিয়ে দিবে। অতঃপর সে ঐ ভাইটিকে চিনি নিয়ে চেক ধরিয়ে দেয়। পরবর্তীতে ঐ ভাই নিশ্চিত হয়, তাকে দেওয়া চেকটি ছিল জাল; সে ধোঁকাবাজি করেছে এবং চিনি নিয়ে গেছে। অতঃপর সে তাকে অনেক খুঁজেও ব্যর্থ হয় এবং শাইখের নিকট আসে। শাইখ রহ. বলেন, আমি তো তোমাকে প্রথমেই একটি শর্ত দিয়েছিলাম। তুমি শর্ত ভঙ্গ করেছ। সে বলল, আসলে অপরাধটা আমারই। আমি আপনার ঋণ পরিশোধের জন্য কিছু সময় চাইছি। অতঃপর সেই ভাই বহুদিন চেষ্টা করে অর্ধেক ঋণ শোধ করে, আর অর্ধেক ঋণ বাকি থাকে।

এরপর তিনি হিজরত করে আফগানিস্তানে তালেবানদের নিকট পৌঁছান। তখনও শাইখের সাথে তার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। অতঃপর ঐ ভাই আফগানিস্তানে ক্রুসেডারদের বোমাবর্ষণে শহীদ হোন। ঐ ভাইয়ের শাহাদাতের পর আমি শাইখ রহ. কে বলি, শাইখ উসামা! আপনি তো জানেন, শহীদদের সবকিছু ক্ষমা করে দেওয়া হয় الا الدين ঋণ ব্যতীত। যেহেতু এই ভাইয়ের নিকট আপনার ঋণ ছিল; এমনকি হতে পারে না যে, আপনি তাকে মাফ করে দিবেন এবং আখিরাতে প্রতিদানের আশা করবেন? অতঃপর শাইখ বললেন, ঠিক আছে, আমি এই ভাইকে ক্ষমা করে দিলাম এবং এই ভাইয়ের সাথে আমার সমস্ত মুয়ামালা এখানেই ক্ষান্ত হলো।

আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করছি। আগামী পর্বে আবার কথা হবে, ইনশাআল্লাহ।

# পর্ব ৩

ইমামুল মুজাহিদীন, মুজাদ্দিদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর সাথে কাটানো দিনগুলোর স্মৃতিচারণের এটি তৃতীয় পর্ব। আমি প্রথমে মুসলমানদেরকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছো জানিয়ে শুরু করতে চাই। আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমানের রোজা, তারাবীহর নামায ও দু'আ কবুল করুন (আমীন)। এই মুবারক মাসকে আমাদের জন্য সাহায্য, বিজয় ও সম্মানের মাস হিসাবে কবুল করুন। বিশেষ করে আমাদের ঐ সকল ভাইদের জন্য, যারা রিবাতের ভূমি শাম, ইয়েমেন, সোমালিয়া ও অন্যান্য এলাকা পূর্ব তুর্কিস্তান থেকে শুরু করে মরক্কো পর্যন্ত জিহাদের কাজে ব্যস্ত আছেন। ইমামুল মুজাহিদীন, মুজাদ্দিদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. ঘটনাবলীর মাঝে রমজানের বিভিন্ন ঘটনাও অন্যতম। যখনই শাইখ ও রমজানের কথা মনে পড়ে, তখনই ঐ রমজানের কথা স্মরণ হয়; যা আমরা তোরাবোরাতে কাটিয়েছিলাম। আজকের এই পর্বে তোরাবোরা সম্পর্কে বিশেষ কোনো আলোচনা করবো না। কেননা আমি তোরাবোরা আর সেখানকার মুজাহিদীনের বীরত্বগাঁথা সম্পর্কে আলাদা একটি পর্বে আলোচনা করবো, ইনশা আল্লাহ। তোরাবোরাতে কীভাবে আল্লাহ তা'আলার তাওফীকে শাইখ উসামা রহ. বিচক্ষণতার সাথে সকল ক্ষেত্রে মুজাহিদদের নেতৃত্ব দিতেন? আর কীভাবেই-বা আমেরিকার পতন, কপটতা ও কাপুরুষতা এবং মুনাফিকদের উপর আস্থা রাখার বাস্তবতা সকলের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়? তাও আলোচনা করবো। তবে এখানে আমি শুধু এতটুকু স্মৃতিচারণ করব যে, তোরাবোরাতে যে রমজান কাটিয়েছিলাম, এর মাঝে এমন এক আলাদা মর্যাদা রয়েছে, যা তাকে অন্য রমজান থেকে আলাদা করে দেয়। সে রমজানের সময়গুলো ছিল আমাদের জন্য খুবই কষ্টকর। শাইখ উসামা রহ. আমাদের সকলকে রসদ ও

খাবারের কমতির কারণে রোজা রাখতে নিষেধ করেছিলেন। আমার আরো মনে পড়ছে যে, আমি তোরাবোরা থেকে শাইখের আগে বের হয়ে যাই। এরপর আমরা পুনরায় ঈদুল ফিতরের সময় মিলিত হই। তিনি তখন আমার কাছে আসেন। আমার স্মরণ আছে, আমি তখন প্রথমে তাঁর দিকে সালাম জানিয়ে এগিয়ে যাই। তারপর মুতানাব্বীর কবিতা দ্বারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাই,

ولأخصنك في منجى بتهنئة * إذا سلمت فكل الناس قد سلموا

"আমি আপনাকে উদ্ধারকর্তা হিসাবে বিশেষভাবে অভিবাদন জানাই,

কেননা, যখন আপনি নিরাপদ থাকেন, তখন সকল মানুষই নিরাপদ থাকে।"

কবিতার সাথে, মুতানাব্বীর সাথে, গৌরব, জিহাদ, বীরত্ব ও সাহসিকতার কবিতা ও যুহদ ও আখলাকের কবিতা এবং কবিতার সাথে শাইখের সখ্যতা নিয়ে অনেক লম্বা ঘটনা রয়েছে। 'শাইখ ও কবিতা' শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র পর্বে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারি, ইনশা আল্লাহ।

আমি আজকের পর্বে আপনাদের সামনে আলেম-উলামাদের সাথে শাইখ রহ. এর সম্পর্কের গভীরতা নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

অনেকে মুজাহিদদের সম্পর্কে এই অপবাদ দিয়ে থাকেন যে, তারা আলেমদের যথাযথ সম্মান করে না, আলেমদের মর্যাদা সম্পর্কে জানে না এবং তাদের ইলমের কমতি রয়েছে, ইত্যাদি।

তাই আমি আলেমদের সাথে শাইখ উসামা রহ. এর অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে এ বিষয়টা স্পষ্ট করে দিতে চাই।

তিনি যৌবনের শুরু থেকেই দ্বীনি শিক্ষার পাবন্দী করে আসছেন। ইলম অন্বেষণের জন্য বহু উলামা-মাশায়েখের ইলমী মজলিসে উপস্থিত হয়েছেন। যেহেতু শাইখ রহ. বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন অবস্থায়ই জিহাদের জন্য বের হয়ে যান। এ কারণে ইলম অর্জনে পুরোপুরি সময় দিতে পারেননি। কেননা জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহর কাজে তিনি

এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, এটিই ছিল তাঁর সর্বক্ষণের কাজ। কিন্তু এই ব্যস্ততাও শাইখকে ইলম অন্বেষণ এবং এর প্রচার-প্রসার থেকে বিরত রাখতে পারেনি। খুব সম্ভব আমি 'فرسان تحت راية النبى صلى الله عليه وسلم'এর মধ্যে আফগানিস্তানে শাইখ উসামা রহ. এর দাওয়াত ও ইলমী কার্যক্রমের উপর কিছু আলোকপাত করেছিলাম যে, কীভাবে সেখানে শাইখ উসামা রহ. এ উদ্দেশ্যে ইলমের দরসসমূহ চালু করেছিলেন।

কিন্তু এখন আমি আলোচনা করবো উসামা বিন লাদেন রহ.এর সাথে উলামায়ে কেরামগণের সম্পর্কের কথা। প্রথমে জাযিরাতুল আরবের আলেমদের সাথে, এরপর আফগানিস্তানের, তারপর পাকিস্তানের আলেমদের সাথে তাঁর কেমন সম্পর্ক ছিল, তা আলোচনা করবো।

উলামায়ে কেরামগণের সাথে শাইখের কিছু সাক্ষাৎকারে আমি নিজে উপস্তিত ছিলাম। কিছু সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে স্বয়ং শাইখ আমার কাছে বলেছেন। আমার স্মরণ আছে, শাইখ আমাকে জাযিরাতুল আরবের আলেমদের সাথে সাক্ষাতের কথাও বলেছেন। শাইখ রহ. তাঁদেরকে জিহাদে বের হওয়ার এবং জিহাদের জন্য প্রস্তুতি ফরয হওয়ার মাসআলা মানুষকে জানানোর উদ্দেশ্যে ফতোয়া প্রদান করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। কেননা উম্মাহর ধ্বংসই এখন শত্রুদের মূল টার্গেট। শত্রুরা চারদিক থেকে উম্মাহকে ঘিরে ধরেছে। ইসলামের ভূখন্ডগুলোর উপর নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করেছে। আর স্পেনের পরাজয়ের পর থেকেই উম্মাহর উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে আছে। এই সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে শাইখ আলেমদের উদ্দেশ্যে বলতেন, তাঁরা যেন উম্মাহর সামনে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ফতওয়া প্রদান করেন।

এই বিষয়ে শাইখ উসামা রহ. আমাকে মুহাম্মাদ ইবনে উসাইমিন রহ. এর সাথে সাক্ষাতের কথা বলেছেন। এটাও এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, শাইখ উসাইমিন

শাইখ উসামা বিন লাদেনকে টেপ-রেকর্ডারের মাধ্যমে বিশেষ প্রশংসাসূচক সনদ প্রদান করেন। এমনকি তিনি এ ব্যাপারে ঘোষণাও দেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের উপর রহম করুন। যাই হোক, শাইখ আমাকে বললেন, আমি শাইখ উসাইমিনকে অনুরোধ করলাম, "শীর্ষ আলেমদের কাউন্সিল থেকে এই ফতওয়া প্রদান করা জরুরী যে, জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করা মুসলমানদের উপর ফরয।" এরপর শাইখ উসাইমিন রহ. স্পষ্টভাবেই তাঁকে এ কথা বলেছিলেন, আমরা শীর্ষ উলামা কাউন্সিল থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো ফতওয়া দিতে পারি না; যতক্ষণ না আমরা উপর থেকে অনুমতি পাই। অর্থাৎ বাদশাহর কাছ থেকে অনুমতি আসে। তখন শাইখ উসামা রহ. আসল বিষয়টি বুঝে নিলেন।

এমনিভাবে উলামায়ে সাহওয়াহর সাথে শাইখ উসামা রহ. এর বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তারা ঐ সকল যুবক আলেম; যারা 'সাহওয়াতুল ইসলামীয়া'র আন্দোলনকে জাযিরাতুল আরবে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। শাইখ উসামা রহ. এদের নিয়ে অনেক আশা পোষণ করতেন। বিশেষ করে খালিজের প্রথম যুদ্ধের পর।

শাইখ তাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করার জন্য বলতেন। তিনি তাদেরকে বলতেন, দাওয়াত ও জিহাদের জন্য হিজরত খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমল। এটা নবীগণ, সালেহীন ও তাদের অনুসারীদের সুন্নতও বটে। শাইখ তাদেরকে বলতেন, সরকার আপনাদেরকে ছাড়বে না, তারা অবশ্যই আপনাদেরকে রুখে দিবে। শক্তি বলে আপনাদের মুখ বন্ধ করে দিবে। এই জন্য আপনাদের উপর আবশ্যক যে, আপনাদের মাঝ থেকে কিছু আলেমকে হিজরতের জন্য প্রস্তুত করবেন। যখন দেশের অভ্যন্তরে আপনাদের উপর জোর-জবরদস্তি করা হবে, তখন বাহির থেকে তো এমন কেউ থাকা দরকার; যারা আপনাদের পক্ষ হয়ে কথা বলবে। শাইখ উসামা রহ. বলতেন, আমি তাদের উপর অনেক মেহনত করেছি। আমার এখনো

শাইখের ঐ কথা মনে আছে, যা তিনি আমাকে ও ভাইদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, ‘জাযিরাতুল আরবের এমন কোনো আলেম নেই, যাকে আমি হিজরতের দাওয়াত দেইনি। চাই আপনারা তাকে চিনেন অথবা না চিনেন। উত্তরে তারা বিভিন্ন ধরনের ওযর পেশ করতেন।’ তারপরও শাইখ তাদেরকে নিজের দূরদৃষ্টি দ্বারা সাবধান করতে থাকেন। আর বাস্তবেও তাই ঘটেছে; যে রকম শাইখ বলেছিলেন। তিনি ঐ সকল আলেমদেরকে বলেছিলেন, অচিরেই আপনাদেরকে গ্রেফতার করা হবে। আপনাদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে। আপনাদেরকে জেলখানায় বন্দী করে রাখা হবে। সবশেষে শাইখ আমাকে বলেছিলেন যে, তখন তাদের থেকে একজন বলেছিল, হে উসামা! যদি আমাদের উপর ভেতর থেকে কোনো বিপদ এসে যায়; তবে বাহির থেকে আমাদের পক্ষে বলার জন্য আপনি তো আছেনই। কার্যত শাইখের দূরদৃষ্টি দ্বারা যেমনটা আশংকা করেছিলেন, বাস্তবে তেমনি হয়েছিল। আপনারা সকলেই তা অবগত আছেন, কীভাবে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে! কীভাবে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে! আর এই কাজ পর্যায়ক্রমে চার বছর বা তার চেয়ে বেশি কিছু সময় ধরে চলেছিল। এ সময়েও শাইখ তাদের নাম শুনে তাদের সম্পর্কে বলতেন এবং তাদের উপর আপতিত নির্যাতনের কথা আলোচনা করতেন। এরপর এক পর্যায়ে সরকার তাদেরকে ছাড়তে শুরু করে।

আমার স্মরণ আছে, যখন আমি জানতে পারলাম, তাদের মধ্য থেকে একজন প্রসিদ্ধ আলেমকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তখন আমি শাইখের কাছে তার কথা বললাম। কিন্তু শাইখ আমার আগেই এ বিষয়ে আরো সবিস্তারে জানতেন। আমি খুশি খুশি শাইখের সামনে আসলাম। আর তাকে বললাম, আলহামদু লিল্লাহ! অমুক শাইখকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। ইনশাআল্লাহ, ওনার থেকে অনেক কল্যাণের আশা করা যায়। শাইখ প্রথমে চুপ ছিলেন। তারপর আমাকে বললেন, আসলে আপনি একটি কথা জানেন না।

আমি বললাম, আল্লাহ আমাদের ভালো করুন। কী হয়েছে? শাইখ বললেন, এই লোকটি সম্পর্কে আমি ভাইদের সামনে কথা বলতে চাচ্ছিলাম না। আমি বললাম, কোনো সমস্যা নেই। পরে শাইখ বলেছিলেন, ওই ব্যক্তিকে সরকার নিজের পক্ষের লোক বানিয়ে নিয়েছে। আর সে যখন বের হয়, তখন মুহাম্মাদ নায়েফের প্রশংসা করতে করতে বের হয়েছিল। আমি 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন'পড়লাম। শাইখ বলতে থাকলেন, আপনার কী জানা নেই, জেলের মধ্যে কী হয়? সরকার জেলকে সুসজ্জিত করে রেখেছে। আরাম,আয়েশের জায়গা বানিয়ে দিয়েছে। যার ফলে এ রকম অনেক লোক বদলে গেছে। আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়লাম। শাইখ বললেন, হ্যাঁ, এ রকমই! অধিক আফসোসের সাথে বলতে হচ্ছে, এ ধরনেরই একজন ব্যক্তি; যিনি নিয়মিত টেলিভিশনের প্রোগ্রামে উপস্থিত হয়ে থাকেন। একটি প্রোগ্রামে শেষ পর্যন্ত সে এটাও বলেছে, "আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে উসামা বিন লাদেন থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছি।"আমি অস্থির হয়ে বললাম, সুবহানাল্লাহ! এটা কী রকম কথা! ভাই আমার, আমার কাছে দু'আ করার চেয়ে অধিক কী সম্বল আছে! আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য এই দুআ করি, তিনি আপনাকে উত্তমভাবে সত্যের পথে প্রত্যাবর্তন করান। আর আপনাকে এমন শাহাদাত দান করুন, যেমন শাহাদাত আল্লাহ উসামা বিন লাদেন রহ.কে দান করেছিলেন।

এমনিভাবে নিজেকে দায়ী দাবীকারী আরেক ব্যক্তি টেলিভিশনের পর্দায় এসে বলতে লাগলো, উসামা বিন লাদেন সুস্পষ্ট পথভ্রষ্ট একজন মানুষ। টেলিভিশনের পর্দায় শাইখকে উদ্দেশ্য করে বলা হলো, আপনি স্পষ্ট বিপদগামী মানুষ! সুবহানাল্লাহ! উসামা বিন লাদেন সুস্পষ্ট পথভ্রষ্ট মানুষ! আর হুসনে মোবারাক ও আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয হলো আমীরুল মু'মিনীন! কতই না নিকৃষ্ট বিচার তাদের! আমি তাদের

উদ্দেশ্যে এ দু'আ করব, হে আমার ভাই! আল্লাহ আপনাকে উত্তমভাবে সত্যের পথে প্রত্যাবর্তন করান। আর আপনানাকে এমন শাহাদাত দান করুন, যেমন শাহাদাত আল্লাহ তা'আলা উসামা বিন লাদেন রহ. অথবা আবু দুজানা খুরাসানী রহ.কে দান করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমান শহীদদের উপর রহমত বর্ষণ করুন। এগুলো ছিল শাইখের সাথে জাযিরাতুল আরবের আলেমদের সাথে ঘটমান কিছু ঘটনা।

অনুরূপভাবে শাইখ উসামা রহ. এর আফগানিস্তানের আলেমগণের সাথে; বিশেষ করে মুজাহিদ আলেমদের সাথে মজবুত সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। আফগানিস্তানে আল্লাহ তা`আলার অন্যতম একটি নিদর্শন হচ্ছে, সেখানে অনেক আলেম রয়েছেন; বিশেষ করে মুজাহিদ আলেম। যখন আফগান আলেমদের সাথে শাইখ রহ. এর সম্পর্কের কথা আসবে, তখন শাইখ ইউনুস খালিসের কথা সর্বাগ্রে আসবে। যিনি একজন আলেম ছিলেন, আবার একজন মুজাহিদও ছিলেন। অন্যদিকে শাইখ ইউনুস খালিসের সাথে শাইখ উসামা বিন লাদেনের সম্পর্ক অনেক দিনের। আমরা এর একটা উদাহরণ দেখি, যখন সুদানের সরকার শাইখ উসামা বিন লাদেনকে সুদান ছেড়ে যেতে বলেন, তখন ইউনুস খালিস রহ. তাঁকে জালালাবাদে আশ্রয় দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁকে তাঁর প্রাপ্য প্রতিদান দান করুন। সুদান সরকারের না-শোকরীর আলোচনা আলাদা শিরোনামে বর্ণনা করবো, ইনশা আল্লাহ।

যাই হোক, শাইখ ইউনুস খালিস উসামা বিন লাদেনকে অভ্যর্থনা জানান অত্যন্ত মর্যাদার সাথে এবং তাঁর অনেক খেদমত করেন। আমার মনে আছে, একবার যখন শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. শাইখ ইউনুস খালিস রহ. এর কাছে আসেন, তখন তাঁকে বলেন, আপনার অনুমতি হলে আমি চাচ্ছিলাম, মিডিয়াতে আপনাকে নিয়ে কিছু কথা বলবো। তখন শাইখ ইউনুস খালিস রহ. বললেন, শাইখ! এতে আমার

অনুমতি নেয়ার কি আছে? যদি জিহাদে এর কোনো প্রয়োজন থাকে; তবে নিঃশঙ্কোচে আপনি তাই করুন। আমার কাছ থেকে আপনার অনুমতি নেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

এমনিভাবে শাইখ উসামা রহ. আমাদেরকে বলেছেন, একবার পাকিস্তানে ইউনুস খালিসের কাছে একজন সৌদি দূত এসেছিল। সে তাঁকে বলল, আপনি উসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় দিয়েছেন! আপনার কী জানা নেই, সে কত ভয়ঙ্কর মানুষ! সে রাষ্ট্রদ্রোহিতায় লিপ্ত। এ রকম আরো কথাবার্তা বলে ঐ সৌদি দূত তাঁর কান ঝালাপালা করে দেয়। শাইখ ইউনুস খালিস রহ. ঐ সৌদি দূতের কথার জবাবে বলেন, "হে আমার ভাই! যদি হারামাইনের ভূমি থেকে একটা জানোয়ারও আমাদের কাছে আসে; তবে আমরা তাকেও আশ্রয় দিতাম। তো এটা কীভাবে সম্ভব যে, আমরা মুজাহিদদের আশ্রয় দেবো না?" তাঁর এই দাঁতভাঙা জবাবের পর সে সৌদি দূত খালি হাতে নাকাম হয়ে ফিরে যায়। আলহামদুলিল্লাহ।

শাইখ ইউনুস খালিস রহ. এর সাথে শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর উত্তম আচরণ সর্বদাই অটুট ছিল। তিনি সব সময় শাইখকে উত্তম নসীহত করতেন। শাইখ উসামা রহ. জালালাবাদ থেকে কান্দাহারে স্থানান্তরিত হওয়ার পর একবার জালালাবাদে আসেন। তখন তিনি শাইখ ইউনুস খালিস রহ. এর সাথে সাক্ষাৎ করতে তাঁর কাছে যান। সে সফরে আমিও ছিলাম তাঁর সাথে। তখন শাইখ ইউনুস খালিস রহ. তাঁকে নসীহত করে বলেন, "হে উসামা! একটু সাবধানে থাকবেন; কেননা টাকা-পয়সার পূজারী লোকের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। সুতরাং যাতায়াতের সময় সাবধানে থাকবেন। বিশ্বস্ত লোক ছাড়া অপর কোনো লোকের উপর ভরসা করবেন না।"শাইখ ইউনুস খালিস রহ. এর এই নসীহত আমার এখনো মনে আছে।

অতঃপর যখন আফগানিস্তানে সাম্প্রতিক খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের হামলা শুরু হয়। তখন শাইখ ইউনুস খালিস রহ. এতই অসুস্থ ছিলেন, যেন প্রায় অক্ষম অবস্থা। তাঁর রানের হাঁড় ভাঙা ছিল। স্বাস্থ্য ছিল খুবই করুণ; কিন্তু অসুস্থতা সত্ত্বেও তাঁর হৃদয় ঈমান ও জিহাদের জযবাতে পূর্ণ ছিল। তিনি একটি ভিডিও বয়ানও জারী করেন। যে বয়ানে আফগান কওম আর উম্মাতে মুসলিমাহকে আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আহবান করেন। যে আমেরিকা আফগানিস্তানে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য হামলা চালিয়েছে। আল্লাহ তা`আলা তাঁদের উপর, মুসলিম উলামায়ে কেরামের উপর রহমত বর্ষণ করুন। (আমীন)

এমনিভাবে শাইখ উসামা রহ. এর সাথে সম্পৃক্ত মুজাহিদীন আলেমদের মাঝে একজন হলেন ‘শাইখ জালালুদ্দীন হক্কানী। আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখুন। তাঁকে ইসলাম ও জিহাদের জন্য কবুল করুন। একদম জিহাদ শুরুর প্রাথমিক সময় থেকে নিয়ে তাঁর সাথে শাইখের অনেক দিনের সম্পর্ক বিদ্যমান। শাইখ উসামা রহ. তাঁর সাথে খোস্ত বিজয়, কাবুল বিজয়, জাওয়ারের যুদ্ধক্ষেত্রগুলোতেও শরিক ছিলেন। আমার মনে পড়ে যখন আমাদের ভাই মুস্তফা আবুল ইয়াজীদ রহ. শহীদ হলেন। তখন শাইখ জালালুদ্দীন হক্কানী শাইখ উসামা বিন লাদেন ও আমার নামে চিঠি প্রেরণ করেন। আমার আরো মনে পড়ে, তিনি শাইখ উসামা রহ.কে উদ্দেশ্য করে এভাবে সম্বোধন করে লিখেন, “আমার প্রিয়তম মুজাহিদ ভাই উসামা বিন লাদেনের নিকট।” আল্লাহ তা‘আলা শাইখ উসামা রহ.কে আপন রহমতের চাদরে ঢেকে রাখুন।(আমীন)

এমনিভাবে আফগানিস্তানের যে সকল আলেমের সাথে শাইখের মজবুত সম্পর্ক ছিল; তাঁদের একজন ‘মৌলভী আব্দুল্লাহ জাকিরী। তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তেমন পরিচিত নন; তবে আফগানিস্তানে সুপরিচিত ছিলেন। মৌলভী আব্দুল্লাহ জাকিরী

‘ইত্তেহাদে উলামা’এর প্রধান ছিলেন। আফগানিস্তানে তাঁর অনেক খ্যাতি ছিল। তাঁর প্রতি মানুষের হৃদয়ে ছিল অনেক সম্মান। তিনি ‘জাকের’নামক গ্রামের অধিবাসী। যা কান্দাহারে আরব পল্লীর কাছেই ছিল। যে সম্পর্কে আমি আগে বলেছিলাম, এটা ছিল একদমই সাধারণ গ্রাম।

আর শাইখের বাড়িও ছিল একেবারে সাদাসিধে। কিন্তু মানুষের হৃদয়ে তাঁর প্রতি অনেক সম্মান ছিল। শাইখ উসামা বিন লাদেন অধিকাংশ সময় তাঁর কাছে যেতেন। একবার আমিও তাঁর সাথে গেলাম। শাইখ তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ ও নসীহত চাইতেন। আর শাইখ আব্দুল্লাহ জাকিরীও নসীহত প্রদান করতে কোনরূপ কার্পণ্য করতেন না। মাশাআল্লাহ, শাইখ আব্দুল্লাহ অনেক হিম্মতের অধিকারী ছিলেন। এমনিভাবে তেজোদ্দীপ্ততা ও বিচক্ষণতারও অধিকারী ছিলেন। জাযিরাতুল আরবে খ্রিস্টান ক্রুসেডার বাহিনীর দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে বয়ান প্রচার করেছিলেন। এমনিভাবে সেখানে অনেক আফগানিস্তানের আলেম-উলামাদের স্বাক্ষরও একত্রিত করেছিলেন। আল্লাহ তা‘আলার কাছে দু‘আ করি- তিনি যেন তাঁর মঙ্গল করেন। তাঁকে ইহকাল ও পরকালে আপন রহমতের ছায়ায় রাখেন।(আমীন)

এমনিভাবে আফগানিস্তানের আলেমদের সাথে শাইখের সম্পর্কের কথা আসলে যার কথা মনে পড়ে যায়, তিনি হলেন ‘শাইখ ইয়াসির রহ.’। আল্লাহ তাঁর উপর অগণিত রহমত বর্ষণ করুন। আমি ব্যাপকভাবে সকল মুসলমানের কাছে, আর বিশেষ করে শাইখ ইয়াসিরের পরিবারের কাছে শাইখের মৃত্যুতে শোক জানাচ্ছি। শাইখ ইয়াসির রহ. পাকিস্তানের গোয়েন্দাদের কাছে বন্দী ছিলেন। আর এভাবেই এক সময় তাঁর মৃত্যুর খবর আসে। যদিও পাকিস্তানি গোয়েন্দাসংস্থা পুরো জোর দিয়েছিল, যেন এই খবর বাহিরে না যায়। কিন্তু তারপরও এই খবরটি প্রকাশ হয়ে যায়। এখনও জানা যায়নি, তাঁর মৃত্যুর আসল কারণ কি? তাঁকে কি হত্যা করা হয়েছে? তাঁকে কি এমনি

অযত্নে-অবহেলায় ফেলে রাখা হয়েছে নাকি তাঁর চিকিৎসার প্রতি খেয়াল রাখা হয়নি? পাকিস্তানি গোয়েন্দাসংস্থা যা কিছুই করে থাকুক এবং যে অপরাধই তারা করেছে, তা অচিরেই প্রকাশ হয়ে যাবে। কিন্তু পাকিস্তানের ইতিহাসে এটা একটা কালো অধ্যায় হয়ে থাকবে। এমনিভাবে পাকিস্তানিদের ইতিহাসও কলঙ্কিত হয়ে থাকবে। পাকিস্তানি সরকার ও তার গোয়েন্দাসংস্থাগুলো যা কিছু করেছে, তা এমন বিশ্বাসঘাতকতা, যার দৃষ্টান্ত মুসলমানদের ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই। তারা এই বিশ্বাসঘাতকতা শুধু এ কারণে করেছিল যে, এর মাধ্যমে তারা অল্প কিছু টাকা-পয়সা দ্বারা নিজেদের পকেট পূর্ণ করবে। আল্লাহর হুকুমে এ সকল টাকা-পয়সা তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿يونس: ٨١﴾

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ দুস্কর্মীদের কর্মকে সুষ্ঠুতা দান করেন না।"(সূরা ইউনুস : ৮১)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿الأنفال: ٣٦﴾

"নিঃসন্দেহে যেসব লোক কাফের, তারা ব্যয় করে নিজেদের ধন-সম্পদ, যাতে করে বাধাদান করতে পারে আল্লাহর পথে। বস্তুতঃ এখন তারা আরো ব্যয় করবে। তারপর তাই তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হয়ে এবং শেষ পর্যন্ত তারা হেরে যাবে। আর যারা কাফের তাদেরকে দোযখের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।" (সূরা আনফাল : ৩৬)

শাইখ ইয়াসির রহ. (আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অগণিত রহমত বর্ষণ করুন) পাকিস্তানের জেলে শহীদ হন। মূলতঃ পাকিস্তানের জেলে যে রকম ট্রাজেডি ও ন্যাক্কারজনক কাজ হয়; তা বাচ্চাদেরকে বুড়ো করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

এমনিভাবে পাকিস্তানের জেলে শহীদ হন মোল্লা উবায়দুল্লাহ রহ.। যিনি ইমারাতে ইসলামীয়ার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। পাকিস্তানের এজেন্সীগুলো তাঁর মৃত্যুর

খবরও গোপন করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তারা তাঁর ব্যাপারটিও গোপন রাখতে পারেনি। অপরদিকে শাহাদাতের এত বছর পরেও এখনো তাঁর লাশ তাঁর পরিবারের কাছে সোপর্দ করা হয়নি।

পাকিস্তানের জেলে বন্দীদের হত্যা করা, এখন একটি সাধারণ ব্যাপার মাত্র। হাজারো, লাখো মানুষদের হত্যা করা হয়েছে। আরো বেশিও হতে পারে। কারণ, আসল সংখ্যা আমাদের কারো জানা নেই। পাকিস্তানি এজেন্সিগুলো তাদেরকে মারার পর লাশগুলো রাস্তার উপর ফেলে রাখে। আপনারা যারা পাকিস্তানের সংবাদপত্র নিয়মিত পড়ে থাকেন, তারা ইন্টারনেটে শেয়ারকৃত সেই ভিডিওটি দেখে থাকবেন যে, সেনাবাহিনী কর্তৃক সওয়াতের একদল মানুষকে বিচার বহির্ভূতভাবে হত্যা করেছে। এভাবেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মানুষদেরকে হত্যা করে থাকে। যার দরুন এক পর্যায়ে প্রতারক আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যন্ত এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে বাধ্য হয়; যারা স্বয়ং এই ধরনের হত্যাকাণ্ডের নির্দেশাবলী দিয়ে থাকে!

যাই হোক, আমরা শাইখ ইয়াসির রহ.কে নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম। তিনি শাইখ উসামা রহ. এর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মাঝে অন্যতম একজন ছিলেন। তাঁদের এই বন্ধুত্বের সম্পর্ক রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় থেকে চলে আসছিল। যেমনটি আমি আমার কিতাব 'তাবরিয়া'তে শাইখ ইয়াসির রহ. সম্পর্কে উল্লেখ করেছিলাম। তিনি ছিলেন আফগানিস্তানের প্রথম পর্যায়ের মুজাহিদ নেতাদের একজন। তিনি কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। যখন জিহাদ শুরু হল, তখন তিনি পাকিস্তানে হিজরত করলেন। অতঃপর জামিয়া ইসলামীয়া মদীনা মুনাওয়ারায় অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তারপর তিনি মুজাহিদদের কাতারে শামিল হয়ে গেলেন। এমনিভাবে তিনি কাবুলে মুজাহিদদের কায়েম করা রাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে যখন তিনি এখানে বিশৃঙ্খলা দেখলেন, তখন

তাদের থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। পুনরায় দাওয়াত ও অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হলেন। অতঃপর যখন 'ইমারাতে ইসলামীয়া'র শাসন প্রতিষ্ঠা হলো। তিনি ছিলেন তাঁদের সাহায্যকারীদের মধ্যে অন্যতম। এরপর যখন আফগানে খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের হামলার আলামত দেখা যাচ্ছিল, তখন তিনি বৃদ্ধাবস্থার কাছাকাছি; সম্ভবত তাঁর বয়স হয়েছিল, প্রায় পঞ্চাশ বছর। তারপরেও তিনি আফগানিস্তানে আসেন। আমার মনে পড়ে, তিনি তোরাবোরায় আমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। এজন্য তোরাবোরা পাহাড়ের বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই পাড়ি দিয়েছিলেন। অথচ তখনো আমেরিকার বোমা বর্ষণের শব্দ শোনা যায়নি। আসার পর শাইখ উসামা রহ.এর সাথে দীর্ঘক্ষণ বসেছিলেন। আমার মনে পড়ে সেই সময় তিনি শাইখ উসামা রহ.কে বলেছিলেন, "আমার আশা ছিল; আমি যেন বায়তুল মাকদিসে শহীদ হই। কিন্তু যখন আফগানিস্তানের জিহাদ শেষ হয়ে গেল, অথচ তখনো আমি বায়তুল মাকদিস পৌঁছাতে পারলাম না; তাই আশাহত হয়ে গিয়েছিলাম। কেননা, আমার আশা পূর্ণ হলো না। এখন যেহেতু খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের হামলা শুরু হওয়ার পথে, তো হতে পারে, এবার আমার বায়তুল মাকদিসে শহীদ হওয়ার ইচ্ছা পূরণ হবে।" আল্লাহর কাছে দুআ করছি, তিনি যেন শাইখকে শহীদদের সওয়াব ও মর্যাদা দান করেন। এমনিভাবে আমার আরো মনে পড়ে তিনি শাইখ উসামা রহ.কে বলেছিলেন, "আমি পাকিস্তানে অবস্থান করছিলাম। সেখানে তাদরীসের দায়িত্ব পালন করছিলাম। কিন্তু এখন আফগানিস্তানে মুজাহিদদের মাঝে থাকার জায়গা ব্যতীত আর কোথাও থাকার জায়গা নেই।"

শাইখ উসামা রহ. তাঁকে অনেক আমলী নসীহত করেন। সুযোগ হলে পরে তা প্রকাশ করবো, ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা শাইখ উসামাকে জিহাদের ক্ষেত্রে অনেক দূরদৃষ্টি দান করেছিলেন। শাইখ তাঁকে বললেন, এই অবস্থায় আপনি

আপনার প্রচেষ্টা মিডিয়ার কাজে লাগান; কেননা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ইলমে দ্বীন ও দাওয়াতের ধরন সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন। অতএব, আপনি মিডিয়ার ক্ষেত্রে অগ্রসর হোন। এরপর শাইখ মুহাম্মাদ ইয়াসির রহ. টিভি চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দেয়া শুরু করেন এবং বিভিন্ন বয়ান প্রচার করতে লাগলেন। পরবর্তীতে যখন আমেরিকা আফগানিস্তানে প্রবেশ করল, তখন তিনি তাঁর হিজরতের স্থল পাকিস্তান থেকে মিডিয়ার কাজে বিরাট ভূমিকা রাখেন। যারা আফগানিস্তানের খবর রাখেন, তাদের আল-জাযিরাতে দেয়া শাইখ ইয়াসির রহ. এর সাক্ষাৎকারের কথা নিশ্চয়ই স্মরণ আছে।

আর যারা শাইখকে আত্মগোপনে থাকার ও ধৈর্য ধরার পরামর্শ দিতেন, শাইখ তাদেরকে বলতেন-

"আমার দিক বিবেচনায় এই মিডিয়ার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখা, তা ইস্তেশহাদী/ফিদায়ী আমলের অনুরূপ-ই। তাই আমি নিজেকে ইস্তেশহাদী তথা উৎসর্গিত মনে করি। কেননা আমি আর এমন কাউকে দেখছি না, যে এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারবে, এ কাজের শূণ্যতা পূরণ করতে পারবে। সুতরাং এ কাজে থাকা অবস্থায় যদি আমাকে শহীদ করে দেয়া হয় অথবা বন্দী করে ফেলা হয়; তাহলে তা আমার জন্য ফিদায়ী আমল হিসাবেই পরিগণিত হবে।"

তাঁকে প্রথমে কাবুলে গ্রেফতার করা হয়। অতঃপর তাঁকে কাবুল প্রশাসন ও মুজাহিদীনের মাঝে বন্দী বিনিময়ের চুক্তিতে মুক্ত করা হয়। মুক্তির পর সাথে সাথে তিনি পুনরায় দাওয়াতের ময়দানে তৎপরপরতা চালাতে শুরু করলেন। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মুজাহিদীনের মাঝে তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রমের ব্যাপক তৎপরতা বিদ্যমান ছিল। এরপর তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। আল্লাহর কাছে দু'আ

করছি- তিনি যেন তাঁর উপর রহম করেন। আমাদেরকে তাঁর সাথে কল্যাণের সাথে একত্রিত করেন। (আমীন)

এমনিভাবে পাকিস্তানের আলেমদের সাথে শাইখ উসামা রহ. এর সম্পর্ক ছিল খুবই গভীর। আমি প্রথমেই বলেছিলাম, তিনি যখন কান্দাহারে ছিলেন, তাঁর কাছে পাকিস্তান থেকে আলেমদের অনেক প্রতিনিধি দল আসত। এ সকল আলেমদের নামের মাঝে একটি উজ্জ্বল নাম হলো 'মুফতী নিযামুদ্দীন শামযাঈ রহ.'। তিনি ছিলেন পাকিস্তানের অত্যন্ত বিখ্যাত একজন আলেম। তিনিও শাইখ উসামার অন্তরঙ্গ মুহিব্বীনদের মাঝে অন্যতম একজন ছিলেন। তিনি যখনই আফগানিস্তানে আসতেন, শাইখ উসামার সাথে অবশ্যই সাক্ষাত করতেন। তাঁর সাহচর্য গ্রহন করতেন, নসীহত গ্রহন করতেন, বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সাথে শলা-পরামর্শ করতেন। আমার মনে আছে, এ রকম এক সাক্ষাতে যখন তাঁর সাথে আমার দেখা হলো। আমি তাঁর কাছে মিসরের চলমান অবস্থা উল্লেখ করলাম। মাশাআল্লাহ, তিনি চলমান ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। মুসলমানদের অবস্থা জানার চেষ্টায় খুবই উদগ্রীব ছিলেন। আমি এই সময় তাঁকে মিশর সম্পর্কে আমার লিখিত বই 'মিসরুল মুসলিমাহ বাইনা সিয়াতিল জাল্লাদীন ও আম্মালাতিল খায়িনীন'উপহার দিলাম। তিনি আমার কাছে মিসর সম্পর্কে আরো অধিক তথ্য জানতে চাচ্ছিলেন। আমার আরো মনে পড়ে আমি তাঁর কাছে এ সম্পর্কিত কিছু বই ও প্রকাশনা পাঠিয়েছিলাম। কান্দাহারে শাইখ উসামা বিন লাদেনের সাথে শেষ সাক্ষাতের সময় তাঁর সাথে তাঁর কিছু সঙ্গী-সাথীও ছিল। তাঁরা আফগানিস্তান সফরে এসেছিলেন। এ সাক্ষাতের কথা আমার ভালো করে মনে আছে, মাওলানা শামযাঈ রহ. তাঁদেরকে উসামা বিন লাদেনের কাছে নিয়ে গেলেন। আর তাঁকে বললেন, এই ভাইদেরকে পথ দেখান। তাঁদেরকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের কাজ করার জন্য উৎসাহ দিন।

শাইখ নিযামুদ্দীন শামযাঈ রহ. সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে আমি ভুলে গেছি। একবার শাইখ নিযামুদ্দীন শামযাঈ রহ. শাইখ উসামা রহ. এর সাথে সাক্ষাত করতে আসলেন। সেই সময় শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. মুসলিম উম্মাহর উপর পশ্চিমা খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের জুলুম, সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলেন। এ বিষয়ে শাইখ উসামা রহ মেহমানখানার দেয়ালে একটি বড় মানচিত্র এঁকে রেখেছিলেন। পাশাপাশি শাইখ আবু হাফস রহ., যিনি আবু হাফস কুমান্দান নামে খ্যাত ছিলেন। (এই বীরও ইতিমধ্যে শহীদ হয়ে গেছেন।) তো তিনি এই মানচিত্রের আলোকে ইসলামী বিশ্বের উপর খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের দখলদারিত্বের ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোচনা করলেন। কীভাবে পশ্চিমা ক্রুসেডাররা মুসলিম বিশ্বের উপর তাদের আইন-কানুন, ষড়যন্ত্র ও সেনাবাহিনী দ্বারা দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করছে! কীভাবে তারা মুসলিম বিশ্বেকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে এবং শ্বাসরুদ্ধ করে রেখেছে। কিভাবে পশ্চিমা ক্রুসেডাররা গুরুত্বপূর্ণ জল, স্থল ও আকাশ পথগুলো দখল করে রেখেছে! এই আলোচনা শাইখ শামযাঈ রহ.এর উপর গভীর প্রভাব ফেলে। পরে যখন তিনি পাকিস্তানের ইসলামাবাদে ফিরে গেলেন। তখন তিনি ইসলামাবাদের একটি হোটেলে এই ধরনের একটি প্রোগ্রামের আয়োজন করেন। আর উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে ইসলামী বিশ্বের একটি মানচিত্র দ্বারা এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে আলোচনা করে বুঝিয়ে বলেন। পরে যখন তিনি দ্বিতীয়বার শাইখ উসামার সাথে মিলিত হোন। তখন তিনি শাইখকে জানালেন, আমি ইসলামাবাদে ফিরে গিয়ে সেই একই লেকচার দিয়ে এসেছি; যা কান্দাহারে আপনারা আমাকে দিয়েছিলেন।

যখন আফগানিস্তানে আমেরিকা হামলা করল। এতে আজকের আবু রিগাল বিশ্বাসঘাতক পারভেজ মোশাররফও অংশগ্রহন করল। সে আফগানিস্তানে আমেরিকার দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বদিক থেকে সাহায্য করল। তখন শাইখ

নিযামুদ্দীন শামযাঈ রহ. এর বিরুদ্ধে তাঁর বিখ্যাত ফতওয়া জারি করেন, "যে শাসকই মুসলমানদের ভূমি দখল করার ক্ষেত্রে কোনো কাফেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে, তাহলে সে তার দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।"

এ ফতওয়া দেয়ার কিছুদিনের মাঝেই শাইখ নিযামুদ্দীন শামযাঈ রহ. কে করাচিতে একটি এনকাউন্টারে শহীদ করে দেয়া হয়। আর হত্যাকারী পলায়ন করে। শাইখ উসামা রহ. তাঁর কোন এক কথা প্রসঙ্গে বলেন, "নিযামুদ্দীন শামযাঈকে হত্যা করার সম্ভাব্য কারণ হলো, মোশাররফের বিরুদ্ধে দেয়া তাঁর প্রচারিত ফতওয়াটি।" আল্লাহ তা'আলা তাঁদের উপর রহমত বর্ষণ করুন। আমাদেরকেও তাঁদের সাথে জান্নাতুল ফিরদাউসের উঁচু মাকামে একত্রিত করুন। (আমীন)

এমনিভাবে পাকিস্তানের আলেমদের মধ্যে যাদের সাথে উসামা রহ. এর সম্পর্ক ছিল; তাঁদের মাঝে একজন হলেন 'শাইখ আব্দুল্লাহ গাজী রহ.।'যিনি ইসলামাবাদে শহীদে লাল মাসজিদ আব্দুর রশীদ গাজী রহ. এর সম্মানিত পিতা ছিলেন। শহীদ আব্দুর রশীদ রহ. এর পরম সৌভাগ্য, তাঁর পরিবারে শুধু তিনি একা শহীদ নন; বরং তিনি শহীদ বাবা ও শহীদা মায়ের সন্তান। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের উপর রহমত বর্ষণ করুন। (আমীন)

শাইখ আব্দুল্লাহ গাজী রহ. তাঁর মাদরাসার উসতায ও সঙ্গীদের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে কান্দাহারে আমাদের সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। তখন তাঁর সাথে শহীদে লাল মাসজিদ আব্দুর রশীদ গাজী রহ.ও ছিলেন। তাঁরা আমাদের সাথে পুরো একদিন কাটান। প্রতিনিধি দলের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত এক সাথী আমাদের সামনে শাইখ উসামাকে নিয়ে আরবীতে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। কিন্তু আফসোস! কবিতাটি আমার এখন স্মরণ নেই। শাইখ আব্দুল্লাহ গাজীর সাথে এ সাক্ষাৎকার খুবই সুখময়

ছিল। শাইখ উসামা রহ. তাঁর সাথে বিস্তারিত কথাবার্তা বলেন। আর তাঁকে বললেন, তিনি যেন পাকিস্তানের আলেমদেরকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেন, যেন তাঁরা মুসলমানদের ভূমিতে বিশেষ করে হারামাইনের ভূমিতে খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের হামলার বিরুদ্ধে ফতওয়া প্রদান করেন। শাইখ আব্দুল্লাহ গাজী শাইখ উসামার কাছে ওয়াদা করেন, ইনশা আল্লাহ, যখন তিনি ফিরে যাবেন, তখন এ বিষয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন। আলেমদের থেকে ফতওয়া সংগ্রহ করবেন ও তাঁদেরকে উৎসাহিতও করবেন।

আমার আরো মনে পড়ে যে, শাইখ আব্দুল্লাহ গাজী এবং শাইখ আব্দুর রশীদ গাজীর সাথে আমারও একবার সাক্ষাত হয়। তখন আমি তাঁদের সামনে মিশরের অবস্থা সম্পর্কে কিছু বর্ণনা দিয়েছিলাম। তাঁদেরকে কিছু বইও হাদিয়া দিয়েছিলাম। যখন শাইখ আব্দুল্লাহ গাজী ইসলামাবাদ ফিরে যান। তখন তিনি নিজের মাসজিদে প্রথম যে খুতবা দেন; তা আফগানিস্তানের অবস্থা এবং মুসলমানদের দেশসমূহে ক্রুসেডার খ্রিস্টানদের হামলা ও এ সমস্ত ক্রুসেডীয় হামলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সম্পর্কে ছিল। এমনিভাবে তিনি শাইখ উসামা বিন লাদেনের সাথে সাক্ষাতের কথাও বলেন। তাঁর দাওয়াতের সাথে একত্বতা ও তাঁর কাজে সাহায্য করার ঘোষণাও দিলেন। এরপর শাইখ আব্দুল্লাহ গাজী রহ. কে তাঁর নিজ মাদরাসার অভ্যন্তরে-ই শহীদ করে দেওয়া হয়। তাঁর ছেলে শহীদ আব্দুর রশীদ গাজী রহ. এক সাংবাদিকের নিকট সাক্ষাৎকারের সময় স্পষ্টতার সাথে এ কথাও বলেছিলেন যে, আমার ধারণা শাইখ উসামা বিন লাদেনের দাওয়াতে মুসলমানদের ভূমি মুক্ত করার আহ্বানে সাড়া প্রদানের কারণেই তাঁর বাবাকে শহীদ করা হয়। আর এর কিছুদিন পরেই জুলুম, ফাসাদ ও মোশাররফের স্বৈরাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কারণে শহীদে লাল

মাসজিদ আব্দুর রশীদ গাজী রহ.কেও শহীদ করে দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সকলের উপর রহমত বর্ষণ করুন। (আমীন)

এখানে এ কথারও উল্লেখ করা দরকার, যা আমি পূর্বে উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছিলাম। তা হলো: কান্দাহারে শাইখ উসামা বিন লাদেনের সাথে সাক্ষাত করার জন্য পাকিস্তানের যত উলামায়ে কেরামের প্রতিনিধি দলই এসেছিল, তাদের মধ্যে অধিকাংশ দলই শাইখের কাছে নসীহত চাইতেন। তখন শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. সর্বদা পাকিস্তানের উলামায়ে কেরামকে এবং পাকিস্তানে ইসলামের জন্য কাজ করতে ইচ্ছুক প্রত্যেক মুসলমানকে একটা নসীহতই করতেন, তা হলো: "ইমারাতে ইসলামীয়া আফগানিস্তানের পরিপূর্ণ সাহায্য করুন। ইমারাতে ইসলামীয়া আফগানিস্তানকে শক্তিশালী করুন।" তাঁরা শাইখ উসামার কাছে পাকিস্তানে কাজ করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেন যে, কিভাবে পাকিস্তানে কার্যক্রম চালানো উচিত? উত্তরে শাইখ তাঁদেরকে বলতেন, "আপনারা ইমারাতে ইসলামীয়া আফগানিস্তানকে শক্তিশারী করার জন্য কাজ করুন। যখন আফগানিস্তানে ইমারাতে ইসলামীয়া প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, তখন আল্লাহর ইচ্ছায় সমগ্র ইসলামী ভূখণ্ডে এর কল্যাণ ছড়িয়ে পড়বে।"

এমনিভাবে পাকিস্তানের আলেমদের মধ্যে যাদের সাথে উসামা রহ. এর সম্পর্ক ছিল। তাদের মাঝে একজন হলেন 'শাইখ ফযল মুহাম্মাদ হাফিযাহুল্লাহ'। তিনি করাচীর একজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ছিলেন। অনুরূপভাবে তিনি শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. ও অন্যান্য মুজাহিদদের অন্তরঙ্গ সাথী ছিলেন। শাইখ ফযল মুহাম্মদ আর শাইখ উসামা বিন লাদেনের এক সাক্ষাতের সময় আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তিনি মুজাহিদদের বিভিন্ন বিষয়ে ও তাদের হালাত সম্পর্কে শাইখর সাথে দরদের সাথে পরামর্শ করতেন। শাইখ ফযল মুহাম্মাদ ফাযায়েলে জিহাদের উপর

একটি প্রসিদ্ধ কিতাবও রচনা করেছিলেন। যা উর্দূ ও পশতু ভাষায় ছাপা হয়। যদি এটির আরবী অনুবাদ বের করা যায়, তাহলে তা থেকে অনেক উপকারের আশা করা যায়, ইনশাআল্লাহ।

এগুলো ছিল শাইখ উসামা রহ.এর সাথে আলেমদের সম্পর্কের কিছু সংক্ষিপ্ত ঘটনা। (টেকনিশিয়ান সাথী সময় স্বল্পতার ইঙ্গিত করছেন। যাই হোক, কথা সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করছি।)

আলেমদের সাথে শাইখ উসামা বিন লাদেনের সম্পর্কের কথা বলতে গেলে, তাঁর সাথে ইসলামী জামাআত এবং তানজীমের সাথে শাইখের সম্পর্কের কথা মনে পড়ে যায়। আমি পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম যে, শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. একজন নরম দিলের মানুষ ছিলেন। তিনি খুব দ্রুতই কেঁদে ফেলতেন। পাশাপাশি তিনি রসিকও ছিলেন। তিনি পরিশুদ্ধ কৌতুক করা পছন্দ করতেন। এর দ্বারা মজলিসকে আনন্দময় করে তুলতেন। ইনশাআল্লাহ, এ বিষয়েও শাইখের ব্যক্তিত্বের কথা আলোচনা করা হবে। তিনি বলতেন, আসলে আমাকে তো একটি তানজীম থেকে বের করে দেওয়া হয়। আমি ইখওয়ানের তানজীমের সাথে ছিলাম। পরবর্তীতে আমাকে সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয়। সুতরাং আমি হলাম তানজীম থেকে বের করে দেওয়া একজন মানুষ!

আসল ঘটনা হচ্ছে: শাইখ জাযিরাতুল আরবে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের জামাআতের সাথে ছিলেন। যখন রাশিয়া আফগানিস্তানের উপর হামলা করল। তখনই শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. মুজাহিদদের সঙ্গে পরিচিত হতে ও তাঁদেরকে সাহায্য করতে পাকিস্তানে চলে আসেন। তাঁকে তানজীমের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ,"তিনি যেন লাহোরের পর আর সামনে না যান। তিনি লাহোরের জামাআতে ইসলামীর অফিসে যাবেন। সেখানে সকল ত্রাণ, সাহায্য তাদেরকে দিবেন এবং তিনি ফিরে আসবেন।

এগুলো মুজাহিদদের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা তারা করবে।”অতঃপর শাইখ সেখানে গেলেন কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি সেখান থেকেই পেশোয়ারে রাস্তা পেয়ে গেলেন। এমনিভাবে মুজাহিদদের সঙ্গও পেয়ে গেলেন। ফলে মুজাহিদদের সাথে কর্মব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তারপর আফগানিস্তানে প্রবেশের রাস্তাও পেয়ে গেলেন। অথচ তানজীম তাঁকে সতর্ক করেছিল। আর বলেছিল যে, আমরা আপনাকে বলেছিলাম, আপনি লাহোরের জামাআতে ইসলামীর অফিসে যাবেন। কিন্তু আপনি পেশওয়ার চলে গেলেন! অবশেষে আফগানিস্তানেও প্রবেশ করে ফেললেন! তো আপনি যখন আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছিলেন, তখন যদি আপনি সেখানে গ্রেফতার হতেন!( তাহলে অবস্থাটা কি হতো?!) কারণ, আপনি হলেন সৌদি নাগরিক। সুতরাং আপনি যদি সৌদি নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও আফগানিস্তানে গ্রেফতার হতেন, তাহলে রাশিয়ানরা সৌদি সরকারের সাথে বড় ধরনের ঝামেলা পাকিয়ে দিত। এভাবেই তাঁরা শাইখের জন্য একটি কাল্পনিক গল্প তৈরি করল। যার মোটকথা ছিল, আপনি আর কোনোভাবেই আফগানিস্তানে জিহাদ করবেন না। আপনার জিহাদ শুধু এতটুকুই যে, আপনি লাহোরে টাকা দিতে থাকবেন। শাইখ উসামা রহ. বললেন, এটা কখনো সম্ভব নয়। তারা বলল, এমতাবস্থায় আপনার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। শাইখ উসামা রহ. বললেন, ঠিক আছে, আমি আপনাদের থেকে বিচ্ছিন্ন!

তানজীম থেকে আলাদা হওয়ার পর আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে জিহাদের জন্য কবুল করে নেন। ফলে তিনি ইসলামী তানজীমসমূহের সেতুবন্ধনে পরিণত হোন। তিনি মুজাহিদ এবং মুসলমানদের মাঝে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হোন। আমি আগেও এ কথা বলেছিলাম, আমি জালালাবাদ বিজয়ের পর জালালাবাদে শাইখের অবস্থান স্থল ‘সোরাকা’তে যেতাম। তখন দেখতে পেতাম, তাঁর চারপাশে বিভিন্ন তানজীমের

ভাইয়েরা বসে আছেন; যাঁরা তাঁর অধীনে কাজ করতেন। তিনি তাঁদেরকে কল্যাণের কাজে লাগিয়ে রাখতেন। আল্লাহ প্রদত্ত এই দানের কারণে আমি তাঁর উপর ঈর্ষা করতাম যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মুসলমানদের মাঝে কি পরিমাণ গ্রহণযোগ্যতা দিয়ে রেখেছেন!

যাই হোক, যখন জাযির যুদ্ধের পর শাইখ উসামা রহ. প্রসিদ্ধি লাভ করলেন। তখন ইখওয়ানুল মুসলিমীনের উপদেষ্টা শাইখ মুস্তফা মানসূরী রহ. তাঁর সাথে দেখা করতে আসলেন এবং শাইখ উসামা রহ.এর সাথে মত বিনিময় করলেন। সে ঘটনা সম্পর্কে তিনি আমাদেরকে বলেছিলেন যে, শাইখ মুস্তফা মানসূরী রহ. তাঁকে বললেন, "হে উসামা! আপনি আপনার ভাইদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন। পুনরায় আপনি আপনার ভাইদের কাছে ফিরে আসুন! কেননা তাদের অধিকার আপনার উপর অধিক রয়েছে।"কিন্তু শাইখ উসামা রহ. বিনয়ের সাথে ওযর পেশ করলেন, "এখন আমি সকল ইসলামী জামাআতের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছি; যা আমার কাজের জন্য সহায়ক। এ জন্য হয়তো আমার এভাবেই কাজ করা উত্তম হবে।"এভাবে শাইখ বিনয়ের সাথে আপত্তি পেশ করলেন। এ জন্য যখন কোনো ইসলামী তানজীমের আলোচনা ওঠতো, তখন শাইখ বলতেন, আমি এমন একজন লোক; যাকে তার তানজীম বের করে দিয়েছে!

এভাবে শাইখ উসামা রহ. এর সাথে ইসলামী তানজীম আর ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা আমি সামনে করবো। তবে আমি আফগানিস্তানে ইমারাতে ইসলামিয়ার সাথে তাঁর সম্পর্কের আলোচনা করার আগে শাইখের জীবনের আরো একটি উজ্জ্বল দিক সম্পর্কে আলোচনা করতে আগ্রহ বোধ করছি। কারণ হয়তো অধিকাংশ লোকজন এ সম্পর্কে জানে না। সেটি হলো: শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহর পথে নিজ ব্যক্তিত্ব ও তার পরিবার

যে বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছিলন। মানুষজন এ সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না। জানলেও সংক্ষিপ্তভাবে জানে। কিন্তু এ পথে শাইখ ও তার পরিবার যে মসীবতের মুখোমুখী হয়েছিলেন, তা সবিস্তারে বলা দরকার।

শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. জিহাদের পথে অনেক কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদাকে আ'লায়ে ইল্লিয়ীনে সমুন্নত করুন। আর যা কিছু তিনি এ পথে হারিয়েছেন আল্লাহ যেন তা কবুল করে নেন। (আমীন)

শাইখ উসামা বিন লাদেনের কাছে দুনিয়ার কোনো মূল্যই ছিল না। তিনি কবির এই পঙ্ক্তির উদাহরণ ছিলেন।

যখন সে ইচ্ছা করল

সমুদ্রের দৃঢ়তা চোখে দেখা দিল,

বিষয়ের সকল দিক দেখে নিল

দৃঢ় মনোবলে সে বের হয়ে গেল।

তলোয়ার ব্যতীত কোনো কিছুর কাছে পরামর্শ চায়নি

তলোয়ার বহনকারী ব্যতীত কাউকে সাথে নেয়নি।

তিনি এমন মানুষ ছিলেন, একবার যদি ইচ্ছা করতেন, তবে তা (আল্লাহর ইচ্ছায় হিম্মতের সাথে) করেই ছাড়তেন। কোনো কিছু বললে তা অবশ্যই পূরণ করতেন। যখন দিতেন তো সব দিয়ে দিতেন। তিনি জিহাদের পথে আসলেন তো নিজের সবকিছু এ পথে দিয়ে দিলেন, কিন্তু এর বিপরীতে তাঁর জীবন মোটেও আয়েশী ছিল না; বরং তাঁর পুরো জীবন বিপদাপদে পূর্ণ ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿البقرة: ٢١٤﴾

“তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনি ভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্যে! তোমরা শোনে নাও, আল্লাহর সাহায্যে একান্তই নিকটবর্তী।” (সূরা বাকারাহ : ২১৪)

শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ তোরাবোরাতে থাকার সময় এই আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে সাথীদেরকে বলতেন, “হে ভাইয়েরা! তোমরাও বলো, ( مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ) “কখন আসবে আল্লাহর সাহায্যে!”তখন সাথী ভাইয়েরা এই আয়াতের শেষের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য এভাবে বলতেন- ( أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ) “আল্লাহর সাহায্যে একান্তই নিকটবর্তী।”

বাস্তবতা হলো, শাইখ উসামা বিন লাদেন জিহাদের পথে খুবই কষ্ট করেছিলেন। তিনি আমাদেরকে বলেছিলেন, রুশদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার সময় কাবুল বিজয়ের আগে শাইখের প্রচন্ড আগ্রহ ছিল যে, তিনি কাবুল বিজয়ের জন্য বড় ধরনের হামলা চালাবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি জিহাদি তানজীমগুলোকে একত্রে ডাকলেন এবং তাদেরকে নিয়ে কাবুলকে অবরুদ্ধ করার জন্য ও তা বিজয়ের জন্য এক বিরাট পরিকল্পনা প্রস্তুত করলেন। এই উদ্দেশ্যে সৈন্য ও শক্তি জোগাড়ের লক্ষ্যে, কাবুল পর্যন্ত রাস্তা খোলার জন্য শাইখ অগণিত সম্পদ খরচ করলেন। অর্থাৎ সময়ও দিয়েছেন, মালও ঢেলেছেন। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তিনি একবার সফরে বের হলেন। আর আমি পূর্বেও বলেছিলাম যে, শাইখ রহ. এর সকল সফরই হতো ইসলাম ও জিহাদের খেদমতের উদ্দেশ্যে। তখন শীতকাল, তুষারপাতও বেড়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে খুব ঠান্ডাও ছিল। বরফের আধিক্যতায় রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল।

শাইখ আর তাঁর সাথীরা না আগে যেতে পারছিলেন না পিছনে আসতে পারছিলেন। যে ব্যক্তি বরফ আর পাহাড়ের এমন অবস্থার সাথে পরিচিত, সে জানে এমন পরিস্থিতি কেমন কঠিন হয়ে থাকে। তাঁরা গাড়ি ছেড়ে পায়ে হেঁটে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। যদি কোনো ঘর পেয়ে যান, তাহলে তাতে আশ্রয় নিবেন। আর এই বরফ আর ঠান্ডা থেকে বেঁচে যাবেন। শাইখ উসামা বলেছিলেন, ঠান্ডা সারা এলাকা ঘিরে ছিল। যাই হোক, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের জন্য এই বিচ্ছিন্ন স্থানে অন্য ধরনের ঘর মিলিয়ে দিলেন। যার মধ্যে দুইজন আফগানি মুজাহিদ ছিলেন। এটা ছিল তাঁদের উপর আল্লাহর বিশেষ রহমত, অন্যথায় হয়তো তাঁরা মারাই যেতেন। তাঁরা এই ঘরে আফগানি দুই মুজাহিদের সাথে আশ্রয় নিলেন। তারা সে দুইজনকে বললেন, "আমাদের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। আর অন্য গ্রামের পথও বন্ধ। তাই যতক্ষণ না বরফ পড়া বন্ধ হয় অথবা রাস্তা খুলে যায়, আমাদেরকে এখানে থাকতে হবে।"এই ঘটনা একটি কঠিন বিপদের উদাহরণ। কিন্তু এছাড়াও তাঁর উপর আরো অধিক কঠিন বিপদ এসেছিল। ইনশাআল্লাহ, এ সকল বিপদ তাঁর মর্যাদা উঁচু হওয়ার কারণ হবে। এ সময়ে শাইখ উসামা বিন লাদেনের খুব খারাপ ম্যালেরিয়া রোগ হয়ে যায়। শাইখ রহ. আমাকে বলেছিলেন, ম্যালেরিয়া ওনাকে একেবারেই নাজেহাল করে দেয়। এমনকি তাঁর পেশাবের রাস্তা দিয়ে রক্ত আসছিল। ডাক্তার ভাইয়েরা জানেন, ম্যালেরিয়া রোগে রক্ত আসা কত মারাত্মক বিষয়। আর অধিকাংশ সময় এর কারণে বিভিন্ন অসুবিধা তৈরী হওয়ার পাশাপাশি এক পর্যায়ে মৃত্যুও হয়ে থাকে। ডাক্তারি পরিভাষায় একে 'কালো জল জ্বর' বলা হয়। ম্যালেরিয়াতে এটি একটি বিপদজনক লক্ষণ। যা লাল কোষগুলির ভাঙ্গন ও কিডনির ক্ষতির তীব্রতার প্রতি ইঙ্গিত করে।

বিশেষ করে, এই বিজন ভূমিতে, জনবিচ্ছিন্ন স্থানে ও প্রচন্ড ঠান্ডাতে এবং বরফের মাঝে এই মারাত্মক ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে গেলেন। শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. বলতেন, আমি তখন মৃত্যুর কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম। ওই সময় যারা ঘরে ছিলেন; তাঁরা ওষুধের জন্য দৌড়ঝাঁপ শুরু করলেন। এই ঘরে একটি ঝুঁটি বিশিষ্ট মুরগী ছিল। এ দিকে ঘরের মালিক এই মুরগীর ব্যাপারে ছিল আবেগপ্রবণ। সাথীরা বলতে লাগলেন, মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত এই রোগীর জন্য আমাদেরকে মুরগীটি জবাই করতে দাও। সাথীরা ওই ব্যক্তিকে বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন; কিন্তু ঐ ব্যক্তি বারংবার নিষেধ করে যাচ্ছিল। এমনকি সাথীরা এর দাম অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়। তারপর সে রাজি হয়ে যায়। তাঁরা সেই মুরগী শাইখের জন্য জবেহ করে দেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা শাইখকে এই মারাত্মক অসুস্থতা থেকে সুস্থতার নিয়ামত দান করেন।

যারাই শাইখের সাথে ছিলেন অথবা শাইখকে চিনেন; তারা জানেন যে, শাইখের শরীরের শক্তি ক্ষীণ ছিল। এমনকি জালালাবাদের যুদ্ধগুলোর সময়, তাঁর শক্তিক্ষীণতার কারণে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। আর তাঁকে ড্রিপের মাধ্যমে খাদ্য দিতে হতো। আমার মনে আছে, তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ হাঁপানি রোগে আক্রান্ত ছিলেন। আর সেও জালালাবাদের যুদ্ধের সময় শাইখের সাথে ছিলেন। আমি এক সময় তার হাঁপানি রোগের কারণে তাকে টিকা লাগিয়ে দিই। আমার এ কথাগুলো বলার উদ্দেশ্যে হলো, শাইখ উসামা রহ. কে শরীরের কমজোরির কারণে অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল।

জিহাদের পথে শাইখ উসামা রহ. এর উপর আসা বিপদসমূহের মধ্যে একটি ঘটনা। আফগানিস্তানে আমেরিকা প্রবেশের পরের কথা। তখন আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। আমরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হচ্ছিলাম, আর প্রায় সময়

আঁধারেই সফর করতাম। এ সময়ে আমাদেরকে একটি পিছলে পাহাড় থেকে নামতে হচ্ছিল; যা থেকে নামার জন্য প্রায় চার ঘন্টা সময় লাগতো। আর স্পষ্ট কথা, আমাদের জন্য কোনো প্রকার আলো জ্বালানো একেবারেই নিষেধ ছিল। যেন এলাকাবাসী কোনোরূপ আন্দাজ করতে না পারে। আমার অবস্থা তো আপনারা বুঝতেই পারছেন; তো যারা জানেন না, তাদেরকে জানানোর জন্য আমি বলছি, শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ.ও শুধু এক চোখেই দেখতে পেতেন। তাঁর একটি চোখ ছিল দৃষ্টিহীন। কেননা বাল্যকালে এক দুর্ঘটনায় তাঁর একটি চোখের আলো চলে যায়। কোনো দৃষ্টিসম্পন্ন লোক শাইখ রহ. এর সেই বিখ্যাত ছবি দেখে বলতে পারবেন না যে, যার মধ্যে তিনি ঈদের সময় নিজের বাম কাঁধের উপর বন্দুক রেখে গুলি চালাচ্ছেন। শাইখ উসামা সাধারণত বাম হাতের ব্যবহার করতেন না। কিন্তু যেহেতু তাঁর ডান চোখ কাজ করতো না। তাই দেখা যেতো, তিনি বাম দিক হতে গুলি চালাচ্ছেন। এক দিকে গভীর আঁধার। অন্য দিকে শাইখের একটি চোখ কাজ করে না। আর আল্লাহ পাহাড়টিকে এমনভাবে বানালেন যে, এর মধ্যে ছোট ছোট ধারালো পাথর ছিল। যার কারণে আমাদের পা বারবার পিছলে যাচ্ছিল। আর আমরা তো কোনো পাহাড়ি লোকও ছিলাম না। এ জন্য নামার সময় আমাদের অনেক কষ্ট হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আর সকল ঈমানদারদেরকে কবুল করুন। যাই হোক, কিছু সময় চলার পর আমরা সামান্য আরামের জন্য বসলাম। শাইখ উসামা বললেন, আপনি কিছু মনে না করলে, একটু পেছনে সরে আসুন। আমি বললাম, কোনো সমস্যা নেই। আমি পেছনে সরে যাচ্ছি। আসলে শাইখ রহ. নিজের পা ছড়াতে চাচ্ছিলেন। তারপর শাইখ বললেন, "আপনি জানেন?, কেন আপনাকে পেছনে যেতে বললাম?" আমি বললাম, কেন? শাইখ বললেন, "আসলে অন্ধকারে আমি পিছলে যাই। আর আমার হাঁটু আমার ওজন নিয়ে একটি পাথরের সাথে এসে

লাগে। ব্যাথার তীব্রতার কারণে আমি এটা বুঝলাম যে, আমার পায়ের হাঁড় ভেঙে গেছে। কিন্তু আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন, যার ফলে আমার হাঁড় ভাঙেনি।” আমি বললাম, আল্লাহর শুকরিয়া! যিনি আপনাকে বাঁচিয়ে দিলেন।

আফগানিস্তানে ক্রুসেডারদের হামলার সময় এ ধরনের আরেকটি সফর করতে হয়েছিল। আমাদেরকে যেতে হয়েছিল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। এতে আমাদেরকে দেড় দিনের পায়ে হেঁটে সফর করতে হয়েছিল। এই সফরের প্রথম ধাপ রাতের প্রথম প্রহরে শুরু হয়। প্রথম ধাপেই চড়তে হবে, একটি বড় পাহাড়ে। রাহবার সাথী আমাদেরকে বললেন, “আপনারা দৃঢ় হিম্মত করুন, যেন আমরা ফজরের আগে অথবা ফজর পর্যন্ত এর চূড়ায় ওঠতে পারি। আমাদেরকে যেন পাহাড় চড়ার সময় কেউ না দেখে। কারণ এখানে মুনাফিকও থাকতে পারে; থাকতে পারে রাখাল আর সাধারণ লোকজনও। তাই আমরা চাই, আমাদেরকে যেন কেউ না দেখে।”এ পাহাড়ে চড়া আমাদের জন্য খুবই কষ্টকর ছিল। তো আল্লাহ তা‘আলা আমাদের জন্য তা সহজ করে দিলেন। এরপর আমরা সফর অব্যাহত রাখলাম। এ সময়ও শাইখ উসামা রহ. এর অনেক কষ্ট হয়েছিল। আল্লাহ তাঁর মর্যাদা উঁচু করুন। এই সফরে তাঁর কষ্টের কারণ ছিল, তাঁর পায়ের মাপের জুতো তাঁর কাছে ছিল না। যারা পায়ে হাঁটেন, বিশেষ করে পাহাড়ে ওঠে থাকেন। তারা জুতোর সামঞ্জস্য হওয়ার ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত। তখন আমরা প্লাস্টিকের সাধারণ জুতো পরতাম। এমতাবস্থায় যদি জুতো পায়ের চেয়ে ছোট অথবা বড় হয়; এটা তো আপনি নিজেই কষ্টের জন্য তৈরি হয়ে গেলেন। কেননা তারপরের প্রতিটি পদক্ষেপ কষ্টকর হয়ে পড়বে। এ সফর উসামা রহ. এর উপর কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। তিনি তাঁর পায়ের মাপের জুতো পাননি। আর অনবরত কষ্ট করে পথ চলছিলেন। কয়েকবার তিনি জুতোও বদলে দেখলেন; কিন্তু কোনো লাভ হলো না। শাইখ এ অবস্থায় চলতে লাগলেন।

এমনকি আমরা এমন এক জায়গাতে এসে পৌঁছলাম; যার সম্পর্কে রাহবার সাথী বললেন, আমাদেরকে এই এলাকা দ্রুত পার হতে হবে। তাই আমরা খুব দ্রুত চলছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমরা সে এলাকা পার হলাম। শাইখ উসামা রহ. এরপর যোহর আর আসরের মাঝামাঝি সময়ে বললেন, কিছু সময় আমরা এখানে আরাম করবো; কিন্তু রাহবার ভাই বললেন, না, এই এলাকা নিরাপদ ও উপযোগী নয়। শাইখ বললেন, সমস্যা নেই। আমরা এখানে আরাম করে নিই। কিন্তু রাহবার বললেন, এ জায়গা একটুও নিরাপদ নয়। আর এ সফরে আরাম করার সুযোগ নেই। অগত্যা আমরা আবার চলতে শুরু করলাম। এমনকি আমরা মাগরিবের সময় পর্যন্ত চলতে লাগলাম। অবশেষে আমরা এসে পড়লাম একটি টিলার পাশে খোলা প্রান্তরে। সেখানে কিছুক্ষণ আরাম করলাম। শাইখ রহ. রাহবারকে বললেন, আমরা রাতটা এখানে কাটাবো। এরপর রাহবার বললেন, না, না। আমরা রাত এখানে কাটাতে পারবো না। এখান থেকে আমাদের গন্তব্য দুই ঘণ্টার রাস্তা। আমরা সেখানে পৌঁছে গেলে ইনশাআল্লাহ খাওয়ার ব্যবস্থা হবে। সেখানে আপনি আরামও করতে পারবেন। কিন্তু শাইখ রহিমাহুল্লাহু বললেন, “আমরা এর চেয়ে বেশি আর হাঁটতে পারবো না।”এরপর রাহবার সাথী বললেন, ঠিক আছে, কিন্তু এটা একেবারে খোলা জায়গা আর এখানে কোনো আড়ালও নেই। শাইখ বললেন, তবুও আমরা রাত এখানে কাটাবো। রাহবার ভাই বললেন, আকাশে তো মেঘ দেখা যাচ্ছে। একটু পর বৃষ্টি শুরু। শাইখ বললেন, তবুও রাত আমরা এখানেই কাটাবো। কয়েক ঘণ্টা এখানে কাটিয়ে সকাল বেলা সামনে যাবো। অবশেষ রাহবার সাথী পরাজয় মেনে নিলেন।

কিন্তু মাটির সাথে পিঠ লাগানোর সাথে সাথে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। আসমান থেকে বৃষ্টি সরাসরি আমাদের উপর এসে পড়ছিল। দুই ঘণ্টা ধরে, একটু থেমে

আবার শুরু হতো। আমরা পুরোপুরি ভিজে গিয়েছিলাম। কোনো জিনিস এমন ছিল না, যার ভেতর পানি ঢোকেনি। কিন্তু আমরা কী আর করতে পারতাম! আমার কাছে ছিল একটি লাঠি আর একটি চাদর; যাকে আমি লাঠির উপর এভাবে গোল করে ছড়িয়ে দিলাম, আর মাথা গুঁজার ঠাঁই হলো। পরে, যার ভেতর এসে ঠাঁই নিল আরো দুই সাথী। আমরা এক চাদরের ভেতর তিনজন হয়ে গেলাম। মূলতঃ এ ছাউনিটি ছিল কোনো রকম বাঁচার জন্যই; কেবল মনকে সান্তনা দেয়া। প্রবল বৃষ্টি মাথায় করে আমরা বসেছিলাম, অন্য দিকে পাহাড়ের উপর বোমার পড়ার মতো বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। অদ্ভুত এক অবস্থা। অবশেষে সকাল হলো। আমরা রওয়ানা হলাম। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেখলাম, বাড়ির মালিক খুবই খুশি। তিনি বলছিলেন, "শুকনো আবহাওয়ার কারণে ফসল নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছিল; আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি দিলেন। আর ক্ষেত পানিতে পূর্ণ হয়ে গেল।"এ কথা শুনে আমার বেশ হাসি এসে গেল। সুবহানাল্লাহ! কীভাবে একজনের বিপদ অপরজনের জন্য নেয়ামত স্বরূপ হয়!

সবশেষে, টেকনেশিয়ান ভাই আমাকে যে সামান্য সময় দিয়েছেন, এই সামান্য সময়ের মধ্যেই আমি শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর পরিবারের উপর আসা কিছু বিপদাপদের কথা আলোচনা করবো। জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহর পথে যে সকল বিপদাপদ এসেছিল, তা শুধু শাইখের উপর-ই এসেছিল, বিষয়টি এমন নয়। বরং তার ধৈর্যশীল, মুরাবিত ও মুজাহিদ পরিবারের উপরও এমন বহু বিপদাপদ এসেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তাঁদেরকে তাঁদের পূর্বপুরুষদের মতো উত্তম স্থলাভিষিক্ত বানান, ইনশা আল্লাহ। আর ইমামুল মুজাহিদ শাইখ উসামা রহ. এর স্মৃতিগুলোকে জীবন্তকারী বানান, ইনশা আল্লাহ।

শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. সন্তানদের উপর আসা বহু বিপদাপদেরও সম্মুখীন হোন। তাঁর যে সকল সন্তানদের উপর বিপদ আসে, তাঁদের মধ্যে একজন আমাদের চোখের মণি সা'দ বিন লাদেন রহ.। তিনি ইরানি গোয়েন্দাদের কাছে বন্দী ছিলেন। ইরানি এজেন্সীগুলোর সাথে আফগানিস্তানের মুহাজিরীন ও বন্দীদের বেদনাদায়ক ঘটনা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। সেখানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, ইনশা আল্লাহ। এই ঘটনা বহু বাস্তবতাকে সামনে নিয়ে আসে। যা জানা উম্মতের জন্য অত্যন্ত জরুরী। সা'দ বিন লাদেন রহ. কোনো অপরাধ ছাড়াই কয়েক বছর ইরানের জেলে বন্দী ছিলেন। তিনি গ্রেফতার হওয়া থেকে বাঁচার জন্যই তাঁর বংশের কিছু লোকের সাথে ইরানের দিকে যাচ্ছিলেন। ইরানিরা তাঁকে পরিবারের লোকদের সাথে গ্রেফতার করে ফেলে। এক সময় সা'দ বিন লাদেন রহ. সেখান থেকে সরে আসতে পেরেছিলেন। তারপর খোরাসান চলে আসেন। তিনি অনেকগুলো বাস্তবতার উপর থেকে পর্দা ওঠান। খোরাসানের মাটিতে তিনি আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শহীদের মহান মর্যাদায় ভূষিত হোন। শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশায় তাঁকে জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহর পথে উৎসর্গ করে দেন।

এভাবে খালিদ বিন লাদেন রহ.ও আল্লাহর পথে শহীদ হোন। এ্যাবোটাবাদে শাইখের সাথেই তিনি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন। আল্লাহ তাঁদের সকলের উপর রহমত বর্ষণ করুন। এমনিভাবে শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর কন্যা খাদীজা বিনতে লাদেন সন্তান প্রসবের সময় চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তাঁকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন। খাদীজা বিনতে লাদেনের স্বামীও আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ করার সময় শাহাদাত বরণ করেন। এমনিভাবে ফাতিমা বিনতে

লাদেনের স্বামীও আল্লাহর রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করেন। খাদীজা বিনতে লাদেনের সন্তান ও শাইখের নাতি তাঁর শাহাদাতের সময় এ্যাবোটাবাদে তাঁর সাথেই ছিলেন। “বিশ্বসন্ত্রাসী আমেরিকা সরকারের আদেশে বিশ্বাসঘাতক পাকিস্তানী গোয়েন্দাসংস্থার নিকট মুহতারাম শাইখের পরিবারের মহিলাদেরকে, সন্তানদেরকে ও নাতী-নাতনীদেরকে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বন্দী থাকার কথা কে না জানে?! যে আমেরিকা ব্যক্তি স্বাধীনতা, মানবাধিকার ও জেনেভা চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি করে থাকে! অন্যদিকে আবার এ সকল ধোঁকাপূর্ণ বিষয়াবলী গাফিলদের নিকট চড়া দামে বিক্রিও করে দেয়!! পাকিস্তানী প্রশাসন পূর্ণ এক বছর যাবৎ এ সকল মহিলাদেরকে, মাসুম বাচ্চাদেরকে ও নাতী-নাতনীদের বিনা অপরাধে বিনা অভিযোগে এবং বিনা বিচারে আটকে রেখেছে!!! তাঁদের অপরাধ শুধু এতটুকুই যে, তাঁরা শাইখ উসামা রহ.এর পরিবার ও সন্তান। যিনি আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দিয়েছেন।” আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করছি। আগামী পর্বে আবার কথা হবে, ইনশাআল্লাহ।

# পর্ব ৪

এটি ‘ইমামের সাথে অতিবাহিত দিনগুলো’ শীর্ষক ধারাবাহিক আলোচনার ৪র্থ পর্ব। এখানে আমি শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ-এর সাথে অতিবাহিত দিনগুলো নিয়ে কিছু উত্তম স্মৃতিচারণ করব। (আল্লাহ তাআলা শায়খের ওপর তাঁর রহমতকে প্রশস্ত করে দিন এবং আমাদেরকেও তার সাথে একীভূত করুন।)

এই পর্বের শুরুতে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করতে চাই। আর তা হলো: পূর্বের হালাকাগুলোর মতো এই হালাকাতেও আমি সেসব শুহাদাদের নিয়ে আলোচনা করতে চাই, যারা আমার সমসাময়িক ছিল এবং যাদের সাথে আমার অনেক স্মৃতিময় ঘটনা রয়েছে। তাদের নিয়ে আলোচনা করব বিধায় জীবিতদের ব্যাপারে আমার ভালো জানাশুনা থাকা সত্ত্বেও তাদের নিয়ে আপাতত আলোচনা করছি না।

কেননা যুদ্ধ তো চলছেই, আর শত্রুরাও আমাদের যেকোনো সংবাদ সংগ্রহের জন্য ওত পেতে আছে। ফলে এমনও হতে পারে যে, এসব সংবাদের সূত্র ধরে ওরা মুসলিম, মুজাহিদ, অথবা জিহাদ ও মুজাহিদদের সাহায্যকারীদের কষ্ট দেবে। আমি এবং আমার ভাইয়েরা জিহাদ ও মুজাহিদদের জন্য এমন কঠিন ও সংকটময় মুহূর্তে তাদের কোরবানির কথা ভুলতে পারব না।

এ যুগে মুমিন মুজাহিদদের বাহিনীগুলো স্বল্প সরঞ্জাম নিয়ে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী বস্তুবাদী সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করেছে। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় মুজাহিদগণ তাদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছে। আমি সেসব জীবিত ভাইদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যারা ব্যাপকভাবে আমাদের প্রতি, জিহাদ এবং মুজাহিদদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাদের উদ্দেশে বলব, এই মুহূর্তে আপনাদের আলোচনা করছি না আপনাদের নিরাপত্তার খাতিরে। ইনশাআল্লাহ এমন দিন আসবে, যেদিন আমরা আপনাদের অবদান ও শ্রেষ্ঠত্বের আলোচনায় ব্যস্ত থাকব।

আমি এখানে সংক্ষিপ্তভাবে স্পষ্ট করব যে, এমন কঠিন বিপদের মুহূর্তে পাকিস্তান ও আফগান জাতি আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে পশতুনের বিভিন্ন গোত্র। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, যারা জিহাদ ও মুজাহিদদের বিপদের মুহূর্তে

পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করেছেন, তিনি যেন তাদের প্রত্যেককে উত্তম প্রতিদান দান করেন। এটি হলো প্রথম বিষয়।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, প্রকৃতপক্ষে আমি মুজাহিদে আজম, ইমামুল জিহাদ, মুজাদ্দিদ শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা তুলে ধরতে অপূর্ণতা অনুভব করছি। কারণ, আমি নিজের মধ্যে কিছু সংকীর্ণতা অনুভব করছি।

রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে ও নির্দিষ্ট কোথাও স্থির থাকতে না পারায় আশা করি ভাইয়েরা আমার অপারগতা অনুভব করতে পেরেছেন। এছাড়াও নিরাপত্তার বিষয়টির প্রতিও লক্ষ রাখতে হয়েছে। কারণ, আমাদের জন্য এবং সকল মুজাহিদদের জন্য সর্বপ্রথম নিরাপত্তা ঠিক রাখতে হবে। আমি সেসব লেখক, ইসলামি চিন্তাবিদ ও গবেষকদের নিন্দা জানাই, যারা শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ-কে ভালোবাসেন, তাঁকে সম্মান করেন, তাঁর অবস্থান সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত আছেন তবুও শায়খকে নিয়ে আলোচনা করেন না। শায়খের প্রিয়জন, বন্ধুবান্ধব, জিহাদের ময়দানে ও হিজরতের সময় তাঁর সাথি ছিলেন এমন ভাইদেরকেও নিন্দা জানাই। কারণ তারা শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ-এর সম্পর্কে কোনো আলোচনা করে না।

ইসলামের ইতিহাসের এই মহান ব্যক্তিকে যদি আমি এই যুগের সালাহুদ্দিন আইয়ুবি বলি, তবে অতিরিক্ত হবে না। তিনি এমন ব্যক্তি, যিনি তাঁর সম্পদ, পড়ালেখা, পরিবার-পরিজন, স্বদেশ, জাতিসত্তা, এমনকি তাঁর ব্যক্তিত্বকে আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করে দিয়েছেন। তাঁর সকল কিছু আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বিলিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ শায়খকে সম্মানিত করুন। কেননা, তিনি যৌবন থেকেই ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরীক হয়েছেন। এরপর বিগত ২০ বছরের কঠিন সংকটময় মুহূর্তে কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া এবং পশ্চিমা ক্রুসেডার আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ

করেছেন। এই পুরো সময়টাতে তিনি এই উম্মতের একজন শ্রেষ্ঠ বীর, অগ্রগামী সিপাহসালার এবং দানশীল নেতার পরিচয় দিয়েছেন। এমন বীরত্বের সাথে আমাদের পরিচিত হওয়া, তাদের সুনাম-সুখ্যাতি আলোচনা করা বড়ই প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তাদের কীর্তিগাথা, ইতিহাস তুলে ধরা আমাদের জন্য একান্ত আবশ্যক।

আজ কোথায় সেই ভাইয়েরা, যারা শায়খের মর্যাদা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত? আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই উম্মাহর মধ্যে এমন মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি। আজ কেন তারা চুপ করে আছে? আমি চাই, তারা যেন বুঝে যে, শায়খের অবদান জাতির সামনে তুলে ধরাটা আমার মতো তাদেরও কর্তব্য।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, যখন কোনো খেলোয়াড়, গায়ক বা ভ্রান্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মারা যায়, তখন অসংখ্য বই প্রকাশিত হয়, পত্রিকার কলামগুলো পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং অনেক ভিডিও চিত্র তৈরি হয়; অথচ ইমামুল জিহাদ শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ যুগের হুবাল আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের অগ্নি প্রজ্বলিত করে গিয়েছেন। শুধু তাই নয়, আমেরিকাও তাঁকে তাদের প্রথম শত্রু মনে করত। সুতরাং শায়খের অবদান আর কোরবানির কথা বর্ণনায় তোমাদের উদ্যম কোথায় হারিয়ে গেল?! প্রকৃতপক্ষে আমি এদের সকলকে নিন্দা জানাই।

শায়খের বন্ধুবান্ধব, সঙ্গী-সাথি, যারা তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে অবগত আছেন এবং যারা হিজরত ও জিহাদের সময় তাঁর সঙ্গী ছিলেন তাদের সকলের প্রতি আমার আহবান, আপনারা শায়খের অবদানগুলো তুলে ধরুন এবং তাঁকে নিয়ে লেখালেখি করুন। কথা বলুন। আর যারা ভালোভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করতে পারেন না কিংবা লেখালেখি করতে পারেন না, তারা যেন সে সকল কল্যাণকামীদের সাহায্য করেন, যারা শায়খের সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং তারা যেন শায়খের স্মৃতিময়

ঘটনাসমূহ ও সুরভিত এই ইতিহাসকে একত্রিত করেন। আমি তার কিছুটা দেখেছি। তবে তারা আমার চেয়েও বেশি দেখেছে। তাই তাদের প্রতি আহবান জানাব, তারা যেন শায়খের এই সুরভিত ইতিহাসকে গোপন না করে, অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তাঁর অবদানগুলো আলোচনা করে এবং সর্বমহলে তুলে ধরে। কারণ এটি আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের একটি অংশ। কোনোভাবেই যেন তাদের দ্বারা শায়খের সুনাম বিনষ্ট না হয়। বরং তাঁর বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে কথা বলা জরুরী। এটি এমন একটি বিষয়, যা আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চেয়েছি।

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, অনেকেই যখন শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে আলোচনা করেন, তখন তারা তাঁর সৃষ্টিগত অবকাঠামো, উত্তম চরিত্র, সম্মান-মর্যাদা ও উদারতা নিয়ে আলোচনা করেন। এগুলো যে তাঁর উন্নত গুণাবলি এতে কোনো সন্দেহ নেই। শত্রুরাও তাঁর এই গুণগুলোর কথা অকপটে স্বীকার করে। আমরা এগুলো অবশ্যই আলোচনা করব। কিন্তু আসলেই কি শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ তাঁর উন্নত চরিত্র ও উত্তম গুণাবলির কারণে একজন ইমাম হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন?

না। বিষয়টি আসলে এমন নয়। তিনি তো এমন একজন সংস্কারক, যিনি আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের আগুন প্রজ্বলিত করেছেন। রাশিয়া বিরোধী জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। পথভ্রষ্ট ও পথভ্রষ্টকারী বিশ্ব মোড়লদের নিষ্প্রভ করে দিয়েছেন এবং তাদের সকল অন্যায় জাতির সম্মুখে তুলে ধরেছেন। এটিই হচ্ছে শায়খের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যতম দিক।

অতএব, হে ভাই,

কেন আপনারা শায়খের আলোচনা করার সময় তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক দিকটি নিয়ে আলোচনা করেন না? যে গুণটির কারণেই মূলত শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ একজন ইমাম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন।

আবার কিছু ভাই শায়খ রহিমাহুল্লাহ-এর কমিউনিস্ট রাশিয়াবিরোধী যুদ্ধের আলোচনা করে থাকলেও তাঁর জীবনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের আলোচনা এড়িয়ে যান।

প্রথমটি হলো : শায়খের আমেরিকাবিরোধী জিহাদ। শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ আমেরিকাবিরোধী জিহাদে সম্মিলিত শত্রুবাহিনীর মোকাবেলায় মুসলিম উম্মাহকে একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন। একমাত্র আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহেই এই প্রচেষ্টায় সফল হয়েছেন।

দ্বিতীয়টি হলো : পথভ্রষ্ট ও পথভ্রষ্টকারী শাসকদের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান। তিনি সত্যই বলতেন, 'অবশ্যই আমরা সাপের মাথা তথা সবচেয়ে বড় শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলব।' তিনি যুগের হুবাল আমেরিকার প্রতি ইঙ্গিত করে বলতেন, 'যখন এই বড় মূর্তিটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তখন তার পদলেহী অনুগতরাও শক্তিহীন হয়ে পড়বে এবং বিভক্ত হতে থাকবে'। এদের বিরুদ্ধে জিহাদের পাশাপাশি তিনি তাদের মুখোশ উন্মোচন করতেন, তাদের সাথে চ্যালেঞ্জ করতেন, তাদের খুঁত বের করে দিতেন এবং এই অসভ্য শাসকদের ভণ্ডামি প্রকাশ করে দিতেন। তাদের বিরুদ্ধে জাতিকে উৎসাহিত করতেন।

হে ভাইয়েরা,

শায়খের এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তো আপনাদের আলোচনায় স্থান পেল না! তাঁর জীবনের অন্যতম এই দুটি দিক কেন আপনারা প্রকাশ করেন না?

হে ভাইয়েরা,

পথভ্রষ্ট শাসকদের বিরুদ্ধে আরব বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। কেননা, তিনি পূর্ব থেকেই জনগণকে এমন একটি বিপ্লবের জন্য উদ্বুদ্ধ করে আসছিলেন। অতঃপর বিপ্লবগুলো যখন সংঘটিত হয়েছে, তখন তিনি সেগুলোর পক্ষে শক্ত ও দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিয়েছেন। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, তিনি এগুলোর নিয়ন্ত্রক ছিলেন। কেননা এই বিপ্লবগুলো ছিল এমন, যা জাতিকে বহির্নিয়ন্ত্রণ ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত করে ইসলামি হুকুমতের দিকে নিয়ে যাবে। ঘটনাপ্রবাহ এটাই সাব্যস্ত করেছে যে, তিনি নিশ্চল মনস্তাত্ত্বিক গণতন্ত্র থেকে জাতিকে সতর্ক করার সিদ্ধান্তটি যথোপযুক্ত সময়েই গ্রহণ করেছেন। ফলে আমেরিকার মুখোশ উন্মোচিত হয়ে গেছে, সত্য স্পষ্ট হয়ে গেছে এবং নিজেদের বিষাক্ত দাঁতগুলো প্রকাশ করে দিয়েছে। ওরা এই বিপ্লবগুলো ধ্বংস করে দিয়েছে ট্যাংক আর সাঁজোয়া যুদ্ধ সরঞ্জাম দিয়ে। বোমারু বিমান দ্বারা সব চূর্ণ করে দিয়েছে। বন্দুক আর কামানের অনবরত গোলা-বারুদ দ্বারা হত্যা করেছে এবং নিজেদের তৈরিকৃত গণতন্ত্রের নীতিমালা নিজেরাই লঙ্ঘন করেছে।

এই ঘটনাসমূহ শায়খের দূরদৃষ্টি ও তাঁর চিন্তার সত্যতা প্রমাণ করে দিয়েছে। তিনি মানুষকে এই বিপ্লবগুলোর প্রতি আহবান করতেন। কেননা, গণতন্ত্রের অচলাবস্তা এই বিপ্লবগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। অনেক ইসলামি দল পথ হারিয়ে ফেলেছে, সবকিছু ঘোলাটে করে ফেলেছে।

শাম, মিসর, লিবিয়া ও তিউনিসিয়া-সহ সর্বত্র যা ঘটে চলেছে, তা আমাদের সামনে স্পষ্ট। ধূর্ত আমেরিকার পক্ষে এসব কিছুই সম্ভব। যদিও মুসলিম দলগুলোর বক্তব্য ও কর্মসূচি ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু প্রত্যেকের প্রচেষ্টা হচ্ছে ধীরগতিতে হলেও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি ইসলামি বিপ্লব সংঘটিত করা। আর এখানেই মুসলিমদের শক্তি

বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে। যেভাবে প্রবল বেগে প্রবাহিত নদী বনাঞ্চলে প্রবেশ করার পর নিশ্চল অথবা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

অতঃপর যখন এই পদ্ধতি সফল না হবে, আমেরিকা তার খারাপ রূপে আবার আত্মপ্রকাশ করবে এবং তার সৈনিকরা অস্ত্র বলে, হত্যা-লুণ্ঠন করে এবং বল প্রয়োগ করে এগিয়ে আসবে। আরব জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করে দিতে মরিয়া হয়ে উঠবে। কেননা আরবরা ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে চায়, বহিঃশত্রুর প্রভাব থেকে দেশকে মুক্ত করতে চায় এবং অভ্যন্তরীণ গোলযোগ থেকে উম্মাহকে উদ্ধার করতে চায়।

আমার ভাইয়েরা,

বর্তমানে মিসরে যা ঘটছে, তা অবশ্যই জঘন্য অপরাধ। এতে অংশ নিয়েছে উদারতা ও মানবতাবাদের ফেরিওয়ালা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা এবং গণতন্ত্রবাদীরা। এ কাজগুলোর সাথে বহিঃশত্রু আমেরিকা পরিপূর্ণভাবে জড়িত। কারণ, আমেরিকা ও আমেরিকার মিত্র বাহিনীগুলো জোরপূর্বক এই আক্রমণগুলো পরিচালনা করেছে, অর্থ জোগান দিয়েছে এবং প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

আফসোসের বিষয় হলো, এই ত্রিপক্ষের সাথে মিথ্যুক সিসির বাহিনীও জড়িত। যারা শরিয়াহকে দূরে ঠেলে দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী ক্রুসেডারদের সাথে মিলিত হয়ে মুসলিম উম্মাহের রক্ত ঝরিয়েছে। এদের প্রত্যেকেই মার্কিন সৈন্যদের পরিসেবায় নিয়োজিত। আজ তারা সবাই আরব গণবিপ্লবের সম্মুখীন হচ্ছে। কারণ তারা নিজেদের ধর্মের দিকে ফিরে আসছে না, ইসলামি বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করছে না এবং বহির্বিশ্বের আধিপত্য ও গোলামী থেকে ফিরে আসছে না।

বর্তমানে মিসরে আমাদেরকে পাপিষ্ঠ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের, ঘাতক সেনাবাহিনীর এবং ফাসেক শাসকগোষ্ঠীর সাথে মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এই বিশাল জোটের

আক্রমণের সম্মুখীন হতে হচ্ছে আমাদের। তাদের এই অপরাধ চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এরা জাতির সাথে গাদ্দারি করেছে। জঘন্য অপরাধের দোষে দোষী এরা। তাই এই জাতির উচিত তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, তাদের জুলুমের পথ বন্ধ করে দেওয়া।

ফকিহগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, সম্মান, দ্বীন ও সম্পদের ওপর আক্রমণকারীকে যেকোনো মূল্যেই হোক প্রতিহত করতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং যেভাবে তারা মুসলিম উম্মাহর ওপর আক্রমণ করে সেভাবে তাদের ওপরও আক্রমণ করতে হবে। আর উম্মাহর কর্ণধারদের উচিত হলো, এসব শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্য সময় উপযোগী ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং উপযুক্ত যেকোনো পথ বেছে নেওয়া।

অপরাধী ব্যক্তি কখনো তার অপরাধের স্বীকার হওয়া ব্যক্তিকে প্রতিরোধের পদ্ধতি বলে দেয় না। জালেম কখনো মাজলুমকে তার জুলুমকে প্রতিহত করার পথ দেখিয়ে দেয় না। বরং মাজলুমকেই সেই পথ আবিষ্কার করে নিতে হয়। ইসলামি শরিয়ায় জুলুমের প্রতিবাদ করা ও প্রতিহত করা ফরজ এবং জুলুম থেকে বাঁচার জন্য কোনো উপযুক্ত পথ বেছে নেওয়ার পর তা থেকে বাধা প্রদান করার অধিকার কারও নেই। এই আলোচনার শুরুতে আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম, তা হলো : তোরাবোরায় শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে আলোচনা করব। কারণ, তোরাবারার সংকটময় মুহূর্তগুলোতে শায়খের উন্নত চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ পেয়েছে। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল, তাঁর সাহায্যের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও শত্রুদের সম্মুখে দৃঢ়তা ইত্যাদি। এমন কঠিন দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে মাত্র তিনশ জন আল্লাহর সৈনিক নিয়ে আমেরিকা ও তার মিত্র

বাহিনী এবং গাদ্দার মুনাফিকদের মোকাবেলা করার সময় তার রাজনৈতিক ও সামরিক অভিজ্ঞতার সুনিপুণ প্রকাশ ঘটেছে।

১৭ই রমজানে শুরু হওয়া তোরাবোরায় যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে ভাইয়েরা আমাকে হযরত হুসাইন ইবনে আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর কথাই বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন। তোরাবোরায় শত্রুদের সামনে তাদের অবস্থা তেমনি ছিল, যেমন ছিল কারবালায় হযরত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর অবস্থা। তারা ছিল বিচ্ছিন্ন। সাহায্য ও রসদ সংগ্রহের পথও বন্ধ হয়ে যায়। তারা চতুর্দিক থেকে মার্কিন বাহিনীর এবং মুনাফিকদের বেষ্টনীতে পড়ে গিয়েছিল। মনে হয় যেন তারা সকলে আফগানিস্তানের যুদ্ধ শেষ করে তোরাবোরার জন্যই একত্রিত হয়েছে। ভাইদের কোরবানি, আত্মত্যাগ, বিপদ, মুসিবত, সবর ও বন্দীত্বের এই যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। এই যুদ্ধে কিছু কঠিন বাস্তবতার প্রকাশ পেয়েছিল। আমি সেগুলোর কিছু আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

প্রথমে যেই বিষয়টি আলোচনা করব, তার শুরুতেই আমি  কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার সাথে সেসব আনসার ও বন্ধুবরদের কথা উল্লেখ করছি, যারা তোরাবোরায় মুজাহিদ ভাইদের সাহায্য করেছেন। এর বিপরীতে উল্লেখ করব কিছু বিশ্বাসঘাতক ও শত্রুদের পা চাটা গোলাম মুনাফিকদের কথা, যাদেরকে এই স্বল্প সংখ্যক মুমিনদের মোকাবেলায় ক্রুসেডার আমেরিকার পতাকায় অংশগ্রহণ করার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল।

এই যুদ্ধে মুজাহিদদের সাহায্যকারীদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম আমি – ধৈর্যশীল, সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ও প্রিয় ভাই শায়খুল জিহাদ মুহাম্মাদ ইউনুস খালেস রহিমাহুল্লাহ-এর সম্পর্কে আলোচনা করব। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন। আমি পূর্বের আলোচনায় তাঁর দৃঢ়তা, শায়খ উসামার প্রতি ভালোবাসা

এবং শক্ত বন্ধন সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমি এখন তোরাবোরায় তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ দিক নিয়ে আলোকপাত করব ইনশা আল্লাহ।

আমেরিকানরা যখন তাদের দলবল ও মুনাফিকদের সামনে নিয়ে জালালাবাদ প্রবেশ করছিল, তখন শায়খ মুহাম্মাদ ইউনুস খালেস রহিমাহুল্লাহ আরব শিশু-নারীদের জন্য তার বাড়ি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। যেন তাদের নিয়ে এই মুনাফিকরা বাণিজ্য করতে না পারে। তিনি তাদের হেফাজত করেছেন। এমনকি তাদের সুন্দরভাবে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে এর উত্তম বিনিময় দান করুন।

আমি আগেও উল্লেখ করেছি যে, তিনি এতটাই অসুস্থ ছিলেন যে, প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে গেছেন। তবুও তিনি এমন একটি ভিডিওবার্তা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, যাতে তিনি মুসলিম উম্মাহকে আফগানিস্তানে মার্কিনবিরোধী যুদ্ধের জন্য আহবান জানাবেন। কারণ, আমেরিকার দ্বারা আফগানিস্তানে জোরপূর্বক দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার কারণে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে গিয়েছে। তাঁর অসুস্থতা এতটাই কঠিন ছিল যে, তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। নিজের সামান্য কাজ করার ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে ফেলেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি দয়া করুন।

দ্বিতীয়ত যেই বীরের কথা উল্লেখ করব, তিনি হলেন মুয়াল্লিম আওয়াল গুল। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন। তিনি ছিলেন লাগমান রাজ্যের অধিবাসী। এটি জালালাবাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য। তিনি শায়খ ইউনুস খালেস রহিমাহুল্লাহ-এর অন্যতম আনসার ছিলেন এবং তাঁর জিহাদি তানজীমের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অতঃপর যখন ইমারাতে ইসলামিয়্যা আফগানিস্তান গঠিত হয়, তখন তিনি ইমারাতে ইসলামিয়্যার দায়িত্বশীল হন এবং জালালাবাদ ট্যাংক পরিচালনা বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন। উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ-এর সাথে শায়খ আওয়াল গুল রহিমাহুল্লাহ-এর সম্পর্ক জিহাদের সূচনা থেকেই। তাছাড়া তিনি জালালাবাদে শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ ও তাঁর

ভাইদের পাশেই থাকতেন। তিনি জালালাবাদে শায়খ ইউনুস খালেস ও তাঁর সাথিদের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'নাজমুল জিহাদ' নামক এলাকায় তাদের সাথে থাকতেন। তিনি শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ-এর সাথে ঘন ঘন সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁর সাথে গভীর সম্পর্ক রাখতেন। এমনকি শায়খ উসামা জালালাবাদ ছেড়ে কান্দাহার চলে যাবার পর যখনই জালালাবাদ আসতেন, তখন মুয়াল্লিম আওয়াল গুল রহিমাহুল্লাহ-এর সাথে সাক্ষাৎ না করে যেতেন না।

তোরাবোরায় আওয়াল গুল রহিমাহুল্লাহ-এর বীরত্বগাথা অনেক বড় বড় অবদান আছে। যখন আমেরিকান সৈন্য জালালাবাদ প্রবেশ করল, তখন তারা ভাবল, মুয়াল্লিম আওয়াল গুল রহিমাহুল্লাহ অন্তত প্রাথমিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবেন না। তাই তারা ট্যাংক পরিচালনা থেকে তাঁর দায়িত্ব পরিবর্তন করেননি। মুয়াল্লিম আওয়াল গুল রহিমাহুল্লাহ শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ-এর নিকট এই মর্মে বার্তা পাঠালেন যে, আমি আপনার অধীনেই আছি। আপনার নির্দেশ হলে আমি এই স্থান ও বর্তমান দায়িত্ব ছেড়ে দেবো এবং আফগানিস্তান ছেড়ে অন্যত্র হিজরত করব। অথবা আপনার আদেশ হলে আমি এই দায়িত্বেই বহাল থাকব এবং আপনার গোয়েন্দা হয়ে থাকব। যথাসাধ্য আপনার সহায়ক ও সাহায্যকারী হয়ে থাকব এবং আপনার খাবরাখবর ও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় জোগান দেবো।

মুয়াল্লিম আওয়াল গুল রহিমাহুল্লাহ বাস্তবে তা-ই করেছেন। বিভিন্ন উন্নতি অগ্রগতি ও খবরাখবর জানাতেন একের পর এক। মুনাফিকরা কী পরিকল্পনা করছে, তারা কী জমা করছে, কী বলছে, কী প্রস্তুত করছে এবং তোরাবোরায় ভাইদের ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্ত কী? একেরপর এক খবরাখবর পাঠাতেন। অতঃপর আমেরিকা তোরাবোরায় যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল। তাদের স্বভাবগত অভ্যাস হলো, তারা কখনো সম্মুখ যুদ্ধ করতে চায় না। তোরাবোরা ঘটনার পর তাদের ব্যাপারে আমাদের এই

অভিজ্ঞতা পরিপূর্ণ হয়েছে। কারণ, পশ্চিমা ক্রুসেড বাহিনী চূড়ান্ত পর্যায়ের ভীতু এবং দুনিয়ার প্রতি তাদের প্রচণ্ড পরিমাণে ভালোবাসা রয়েছে। তারা বড় ধরনের শক্তি অর্জন ও যুদ্ধ প্রস্তুতি ছাড়া কখনো সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না। তারা সব সময় মুনাফিকদের সামনে রেখে যুদ্ধ করে। যেমনটি ঘটেছে ইরাক, ভিয়েতনাম-সহ বিভিন্ন যুদ্ধে।

আমেরিকানরা তোরাবোরা অবরোধ করার জন্য জালালাবাদের মুনাফিক ট্যাংক বাহিনীকে অগ্রে পাঠিয়ে দেয়। আকাশ থেকে বোমা বর্ষণের দায়িত্ব নিজেদের হাতেই রাখে। যাতে তারা নিরাপদে থাকতে পারে।

অবশেষে মুয়াল্লিম আওয়াল গুল রহিমাহুল্লাহ-এর প্রতি নির্দেশ আসলো, তোরাবোরা অবরোধে তার বাহিনী নিয়ে অংশগ্রহণ করতে। তখন তিনি শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ-এর নিকট পরামর্শ চেয়ে একটি বার্তা পাঠালেন। 'আমি এখন কী করব? আমি কি আমার এই অবস্থান ত্যাগ করে আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যাব? না আমার বাহিনী নিয়ে তোরাবোরা অবরোধে এগিয়ে যাব? আমি আপনাকে ওয়াদা দিচ্ছি, প্রত্যেকটি গোলা মুজাহিদদের অবস্থান থেকে দূরে খালি পাহাড়ে নিক্ষেপ করব'।

তখন আমরা তোরাবোরায় ছিলাম। আমি এবং অপর এক ভাই ক্রোধান্বিত হয়ে বলে উঠলাম যে, 'শায়খ আওয়াল গুল মুরতাদদের কাতারে যায় কীভাবে?! অথচ তিনি একজন মুজাহিদ।' তখন শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে বললেন, 'হে ভাইয়েরা, একজন ব্যক্তি (সে আমাদের সাহায্যকারী ও বন্ধু) আমাদের থেকে দূরে খালি প্রান্তরে বোমা বষর্ণ করাটা অন্য একটা শয়তান সরাসরি আমাদের দিকে বোমা বর্ষণ করার চেয়ে অনেক ভালো।' আমরা বললাম, 'ঠিকই তো।' তারপর তিনি আওয়াল গুলের কাছে বার্তা পাঠিয়ে বললেন, 'ভালো, এই কাজে আল্লাহর ওপর ভরসা করো।' আর বাস্তবেও তিনি তা-

ই করেছেন। আমরা দেখছিলাম, তাঁর গোলাসমূহ আমাদের পাশের পাহাড়ে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।

আওয়াল গুল রহিমাহুল্লাহ-এর আরও একটি বীরত্বপূর্ণ ঘটনা হলো, (এটি অন্য একটি ঘটনা। আমরা তা শায়খের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। তিনি কীভাবে অবরোধ থেকে অনেককে উদ্ধার করে তাদেরকে দীর্ঘ যুদ্ধের জন্য তৈরি করেছেন।) যখন শায়খ তোরাবোরা থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি সকলকে বিন্যস্ত করলেন। এরপর শায়খ ও তাঁর সাথে অনেক ভাই একটা প্রশস্ত জায়গায় সরে যান। সেখান থেকে আরও কয়েকটি জায়গা পরিবর্তন করে জালালাবাদ থেকে বের হয়ে যান। কে শায়খকে জালালাবাদ থেকে বের হতে সাহায্য করেছে?

তিনি হলেন বীর, শহীদ মুয়াল্লিম আওয়াল গুল রহিমাহুল্লাহ। তিনি নিজ পাহারায় তার গাড়িতে করে শায়খকে তাঁর সম্মান ও মর্যাদার সাথে বের করেছেন। আমি এই প্রথমবার তাঁর এই মহৎ কাজের বর্ণনা করছি। অতঃপর আমেরিকানরা তাঁকে সন্দেহ করে এবং বন্দী করে। তারপর বাগরাম কারাগারে ও শেষে গুয়ান্তানামোতে নিয়ে গিয়েছে।

আমেরিকানরা দাবি করে যে, তিনি গুয়ান্তানামোতে হৃদরোগ আক্রান্ত হয়ে শহীদ হয়েছেন। আমার খুব বেশি সন্দেহ হয় যে, তারা তাঁকে হত্যা করেছে অথবা চেষ্টা করেছে। কিংবা তাঁর এই বীরত্বের কারণে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাঁকে শহীদ করেছে। আমি বুঝি না, তারা তাকে চিনতে পেরেছে কি না? তবে তারা আওয়াল গুল রহিমাহুল্লাহ-এর ইতিহাস, সত্যতা, শায়খ উসামার সাথে তাঁর সম্পর্কের ব্যাপারে জানত। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন।

আফগানিস্তানে তীব্র বোমা বর্ষণের বর্ণনার পূর্বে আমি শায়খ আওয়াল গুল রহিমাহুল্লাহ-এর আরও একটি বীরত্ব বর্ণনা করছি। তিনি শায়খ উসামাকে বলেছেন যে, 'আমি আপনার জন্য আফগানিস্তানের উৎকৃষ্ট মুজাহিদদের একত্রিত করতে প্রস্তুত। তাদের সামান্য কিছু বিষয় ছাড়া পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি রয়েছে। যখন আমেরিকানরা প্রবেশ করবে, তখন তারা প্রস্তুত থাকবে। এ কাজ আমি করতে প্রস্তুত।' শায়খ উসামা তাঁর কথা খুবই স্মরণ করতেন। এই বীরত্বের দরুন আল্লাহর কাছে তিনি সর্বদা তাঁর জন্য উত্তম বিনিময় কামনা করতেন।

এই ধরনের বীরত্বগাথা ঘটনা শুধু তাঁর থেকেই প্রকাশ পেত না; বরং জালালাবাদ ও তার আশপাশের অনেকের থেকেই এগুলো প্রকাশ পেত। জীবিত ভাইদের নাম প্রকাশ না করার জন্য আমি ভাইদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যদিও তাঁরা আমাদের সাহায্য করেছেন, পাশে দাঁড়িয়েছেন, আমাদের শক্তিশালী করেছেন এবং তারা তাদের প্রকৃত ইসলামি জিহাদের খনিকে প্রকাশ করেছেন। আফগান মুসলিমদের জন্য তারা তাদের ভেতরকে খুলে দিয়েছেন। যার ফলে আল্লাহর অনুগ্রহে প্রথমে রাশিয়া তারপর আমেরিকা ধ্বংস হয়েছে।

আমি শায়খ আওয়াল গুলের বন্ধুবান্ধব, সন্তানসন্তুতি, তাঁর স্বজাতি, জালালাবাদের অধিবাসী ও আফগানের মুসলিম জাতিকে আহবান করব, তারা যেন প্রতিশোধ গ্রহণ করে – তাঁকে শহীদকারী আমেরিকার কাছ থেকে, সে সকল বিশ্বাসঘাতকের কাছ থেকে – যারা তাঁকে হস্তান্তর করেছে এবং তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ইনশাআল্লাহ আমি তাদের একজনের আলোচনা করব। তারা যেন তাঁর প্রতিশোধ না নিয়ে ছেড়ে না দেয়। শায়খ আওয়াল গুল আমাদের, আফগানিস্তানের সকল মুজাহিদের এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর নিকট একটি আমানত ছিল। তাই উচিত হল এই বীর মুজাহিদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নেওয়া।

তিনি কঠিন সময়ে সঠিকভাবে সবার পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর যেসব দূত আমাদের কাছে সংবাদ নিয়ে আসতেন, তাদের একজন আমাদের কাছে এসে বলল, 'মুয়াল্লিম আওয়াল গুল দরজা বন্ধ করে কেঁদে কেঁদে বলছেন, "আমি শায়খ উসামা ও তাঁর সাথিদের জন্য কী করতে পারি?"

এই ভাই তাকে ধৈর্যধারণের কথা বলতেন এবং বলতেন, "এমনি ছিল নবী-রাসূল ও সালেহীনদের অবস্থা। সুতরাং অবশ্যই এখানে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে।" আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন।'

আমি শায়খ আওয়াল গুল রহিমাহুল্লাহ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করছি। এক ভাই শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ-এর কাছে এসে বললেন, 'যে ব্যক্তি আওয়াল গুলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আমরা তাকে চিহ্নিত করেছি। আমরা তার হত্যার আয়োজন সম্পন্ন করতে চাই।' তখন শায়খ উসামা তাদের বললেন, 'সন্দেহবশত কাউকে হত্যা করবেন না। প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করুন। দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া কাউকে হত্যা করবেন না। বাস্তবেই কেউ যদি আমরিকার সাথে মিলে কাজ করে এবং তার বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে থাকেন, তবেই তাকে হত্যা করতে পারেন।'

তোরাবোরার ঘটনার সাথে জড়িত অন্য একজন বীরের আলোচনা করছি। তিনি হলেন শহীদ কারি আব্দুল আহাদ। রাশিয়াবিরোধী জিহাদের একজন বীর সৈনিক তিনি। শায়খ ইউনুস খালেসের হিজবে ইসলামি আফগানিস্তানের অন্যতম সদস্যও ছিলেন। রাশিয়াবিরোধী জিহাদের সময় তিনি সেই দলের একজন কমান্ডার ছিলেন। তোরাবোরায় তিনি সম্মানজনক কৃতিত্ব রেখেছেন। প্রায়ই আমাদের সাক্ষাতে আসতেন। আমাদের সাথে তার অঙ্গীকার ছিল। তাই আমাদের নিকট বিভিন্ন সংবাদ সরবরাহ করতেন। কারি আব্দুল আহাদ আমাকে ও আরও অনেক ভাইকে

তোরাবোরা থেকে বের করে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর সব কৃতিত্বের কথা বাদ দিলেও অন্তত এটা বলতেই হয় যে, তিনি আমাদের তোরাবোরা থেকে বের হওয়ার একটা রাস্তা বের করে দিয়েছেন। ফলে আমরা নিরাপদ স্থানে পৌঁছুতে সক্ষম হই। আল্লাহ তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

তোরাবোরা থেকে বের হওয়ার সময় আমরা আশ্চর্য ধরনের একটা জায়গা অতিক্রম করলাম। সেখানে আল্লাহর কুদরত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি এবং বুঝেছি যে, আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন, এর অতিরিক্ত বান্দাকে কোনো কিছু আক্রান্ত করবে না। মনে হয় এই ঘটনাটি আমি আমার কোনো আলোচনার ফাঁকেও বলেছি। সংক্ষেপে এর বিবরণ হলো, রাতের আঁধারে আমি, আমার সাথে কয়েকজন মুজাহিদ ভাই এবং কয়েকজন আনসার ভাই কারি আব্দুল আহাদ ভাইয়ের সাথে এক স্থান থেকে অন্যত্র সফর করছিলাম। আমরা এক জায়গায় আসলাম। কারি আব্দুল আহাদ ভাই আমাদের অপেক্ষা করতে বলে তিনি রাস্তার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে চলে গেলেন। এসে বললেন, 'রাস্তা নিরাপদ। আপনারা আসতে পারেন।' আমি সেই রাস্তা সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। তবে তার সাথে চলতে থাকলাম। দেখলাম, রাস্তার কোল ঘেঁষে দেয়াল উঠানো। যখন আমরা আরও কাছে গেলাম, তখন দেখলাম, এটা মুনাফিকদের একটা ঘাঁটি। যারা জালালাবাদ ও আশেপাশের এলাকাগুলো দখল করে নিয়েছে।

হঠাৎ দেখলাম, আমাদের থেকে প্রায় ৫/৬ মিটার দূরে দেয়ালের মধ্যে বড় একটি ফাঁকা দেখা যাচ্ছে। যার আশপাশের ৩/৪ মিটার দেখা যায়। আমরা ঠিক তার সামনে দিয়েই যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মুনাফিকদের একটা গাড়ি আসলো এবং এই ছিদ্রের ফাঁক দিয়ে লাইটের আলো আমদের শরীরে এসে পড়ল। ফলে আমাদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমরা তাদের মুখোমুখি হয়ে গেলাম।

আমি একটা গাছের আড়ালে ছিলাম। আমার সাথে অন্য একজন ভাইও ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, 'অস্ত্র প্রস্তুত করুন।' আমি বললাম, 'কী হলো?' তিনি জানালেন, 'তারা আমাদের স্পষ্ট দেখছে। অর্থাৎ এক্ষুনি আমাদের তাদের সাথে লড়াই করতে হবে।' লম্বা আকৃতির একজন ভাই ছিলেন আমাদের সাথে। তিনি আত্মগোপনের জন্য কিছু পাচ্ছিলেন না। ফলে নিজেকে গোপন করার জন্য তিনি চিত হয়ে শুয়ে পড়লেন। আমরা সেকেন্ডের মধ্যে যুদ্ধ শুরু করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে রাস্তা পরিবর্তন করে চলে গেল। বুঝতে পারিনি, সে কি রাস্তা পরিবর্তন করতে চেয়েছিল, না আমাদের দেখে ভয়ে পালিয়েছে?

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, গাড়িটা যাওয়া মাত্রই একজন আনসার ভাই আসলেন। তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী গঠনের ও মজবুত পেশীবিশিষ্ট। তিনি সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে দৌড়াচ্ছিলেন। আমরা আনুমানিক তিন কদম অগ্রসর হতেই আঁধারের কারণে দুর্গন্ধময় একটি নালার মধ্যে পড়ে গেলাম। অস্ত্রটাও উধাও হয়ে গেল এবং আমরাও চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লাম। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তিনি খুব দ্রুত নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে নিলেন এবং পুনরায় আমাকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে দৌড়াতে লাগলেন। আমরা আমাদের মারকাজের দিকে ছুটলাম এবং একটা রাস্তা পেয়ে খুব দ্রুত দৌড়াতে লাগলাম।

সেখানে আমাদের সাথের আনসাররা ছিলেন পূর্ণ যৌবনে বলীয়ান। একমাত্র আমিই ছিলাম প্রায় পঞ্চাশের কোঠায়। আমি এমনিতেই দুর্বল ছিলাম। এক ভাই সেই সুঠামদেহী ভাইকে বললেন, 'ভাই আপনি ড. সাহেবকে পিঠে তুলে নিন।' আমি বললাম, 'না, না আমাকে তুলো না।' আমরা সবোর্চ্চ গতিতে দৌড়াতে লাগলাম। একটি গাড়ি এসে প্রথম রাস্তায় সামান্য সময় দাঁড়াল। কিন্তু আল্লাহর অশেষ করুণায়

আমরা সেখান থেকে নিরাপদে সরে গেলাম। ততক্ষণে কারি আব্দুল আহাদ আমাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে গিয়েছেন। অতঃপর তিনি আমাদের মেহমানদারি করলেন এবং খাবারের আয়োজন করলেন। তারপর সেখান থেকে আমরা তাঁর নেতৃত্বে অন্যত্র সরে গেলাম। আল্লাহ্ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

কারি আব্দুল আহাদ আফগান সেনাবাহিনী তাঁর বাড়ি তল্লাশি করতে আসলে তাদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

আমি সমগ্র পৃথিবীর মুজাহিদ ভাইদের বিশেষত জালালাবাদ ও আফগানিস্তানের মুজাহিদ ভাইদের বলব যে, মুয়াল্লিম আওয়াল গুল, কারি আব্দুল আহাদ ও আফগানিস্তানের সকল শহীদ ভাইদের খুনের বদলা নেওয়ার দায়িত্ব আপনাদের ওপর। আমেরিকা ও তাদের সাহায্যকারী প্রত্যেকের থেকে এই বদলা নেওয়া আবশ্যক। আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করলাম।

# পর্ব ৫

এটি 'أيام مع الإمام' (ইমামের সাথে অতিবাহিত দিনগুলো)-এর ৫ম পর্ব। এই পর্বে আমি ইমামুল জিহাদ, মুজাদ্দিদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহু-এর সাথে অতিবাহিত দিনগুলোর কিছু উত্তম স্মৃতিচারণ করব। আল্লাহ তাঁর ওপর রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন এবং আমাদেরকেও তাঁর সাথে উত্তমভাবে মিলিত হওয়ার তাওফিক দান করুন।

গত পর্বের শুরুতে তোরাবোরার স্মৃতি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং বলেছিলাম এই পর্ব আমরা বন্ধু ও শত্রুদের আলোচনা দিয়েই আরম্ভ করব। গত পর্বে আমাদের

বন্ধু, মিত্র ও সাহায্যকারী ইউনুস খালেস রহিমাহুল্লাহু-এর কথা উল্লেখ করেছিলাম। স্মরণ করেছিলাম শহীদ কমান্ডার মুয়াল্লিম আওয়াল গুল রহিমাহুল্লাহু-এর কথাও। আরো স্মরণ করছিলাম ক্বারি আব্দুল আওয়াল রহিমাহুল্লাহু-এর কথা।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করতে চাই। তা হলো, আমি শহীদদের নিয়ে আলোচনা করব। আর জীবিতদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আমার আশঙ্কার কারণে তাদের আলোচনা আপাতত করছি না। যেহেতু এখনো যুদ্ধের তীব্রতা কমেনি এবং শত্রুরাও তথ্য সংগ্রহের জন্য অধীর অপেক্ষায় বসে আছে। অথচ এই জীবিত মুজাহিদ ভাইদের কাছে আমরা চির ঋণী। আমাদের প্রতি তাদের অনেক অবদান রয়েছে। যা কখনো ভুলা সম্ভব না। আমরা যেন তাদের উপকার ও অবদানের প্রতিদানস্বরূপ তাদের জন্য কিছু করতে পারি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সেই তাওফিক দান করুন, আমিন।

আমরা যদি তাদের সেই প্রতিদান পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হই, তাহলে আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের পক্ষ থেকে তা পৌঁছে দেন। তাদের প্রতি আমাদের পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ মূল্যায়ন, অগাধ ভালোবাসা, যথাযথ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা রয়েছে। ইনশাআল্লাহ অচিরেই এমন দিন আসবে, যেদিন আমরা তাদের স্মৃতিচারণ করতে পারব। তাদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সকল জিহাদি সংগঠন ও মুজাহিদদের প্রতি তাদের অবদানগুলো বর্ণনা করতে পারব।

এই পর্ব রেকর্ডের পূর্বে আমি এক ভাইয়ের সাথে তোরাবোরার অবরোধ নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তখন তিনি আমাকে সিরিয়ার হোমসে আমাদের মুসলিম জনগণের ওপর অবরোধের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। কীভাবে জাতিসংঘ তাদেরকে ধোঁকা দিয়েছিল, সেই আলোচনা করলেন! এই দূষিত-দুষ্কর্মা সংগঠনটিকে নিয়ন্ত্রণ করে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ পাঁচ অপরাধী। এদের লক্ষ্য হলো, বিশ্ববাসীকে ধোঁকা

দেওয়া এবং এই মিথ্যা কথাটি বোঝানো যে, এখানে প্রত্যেক মানুষের অধিকার ও স্বার্থ রয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, সেখানে কেবল এই পাঁচ অপরাধীর অধিকার রয়েছে। এরা ঘোষণা দেয় এবং দাবি করে যে, আমরা প্রতিটি মানুষকে সমানভাবে মূল্যায়ন করি। কিন্তু আসলে এরা ধোঁকা দিচ্ছে। যা আমি ইতিপূর্বে আমার ‘ فرسان تحت راية النبي’ নামক কিতাবের দ্বিতীয় সংস্করণে উল্লেখ করেছি।

আমি সেখানে বলেছিলাম, এই দুষ্কর্মারা বলে যে, ধর্ম, জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ সমান। কারো মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। বাস্তবতা হচ্ছে, এ কথার মধ্য দিয়ে তারা দুটি প্রধান বিভাজনকে গোপন করে। আর এই দুটি বিভাজনের মাধ্যমে তারা মানুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে থাকে—

প্রথমটি হচ্ছে দেশ ও জাতীয়তা ভিত্তিক বিভাজন: এই পদ্ধতি অনুসরণ করে তারা কেবল একটি জাতির মাঝে বিভেদ তৈরি করে। যেখানে আমরা সমগ্রটাই একটা জাতি, একটা উম্মাহ – সেখানে তারা এটা মিশরীয়, এটা ভারতীয়, এটা পাকিস্তানী বলে বিভাজন করে। আর এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, উম্মতে মুসলিমাকে ৫০টিরও বেশি রাষ্ট্রে ভাগ করা। অথচ একটা সময় আমরা ছিলাম একটি মাত্র রাষ্ট্রের অধীনে।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে ক্ষমতাভিত্তিক বৈষম্য: এর কথা তারা কখনোই বলে না। তারা কথা বলে গণতন্ত্রের, সাম্য ও নিরপেক্ষতার। তাদের এই সবগুলোই নকল ও ভেজাল মিশ্রিত। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে, এই শক্তি ও ক্ষমতার মাধ্যমে তারা মানুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে থাকে। এভাবেই এই পাঁচটি শক্তি সারা পৃথিবীকে শাসন করছে এবং অবশিষ্ট দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষদের ওপর দাপট দেখাচ্ছে।

নোংরা এই সংস্থাটি (জাতিসংঘ) আমাদের হোমসের জনগণকে ধোঁকা দিয়েছে এবং অবরোধ থেকে বের করে এনে তাদেরকে বর্বর বাশার আল-আসাদের জেলে প্রেরণ করেছে। তোরাবোরাতে আমাদেরকেও একই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। আমাদেরকে

বলা হয়েছিল, যেন আমরা তোরাবোরা থেকে বেরিয়ে আসি এবং জাতিসংঘের কাছে আত্মসমর্পণ করি। সামনে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহে আমরা তা অস্বীকার করে বলেছিলাম, "হয়তো আমরা নিজেরা জীবিত বের হবো, নয়তো মৃত্যু পর্যন্ত লড়াই করে যাব।"

যাহোক, পুনরায় তোরাবোরার আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি। আজ এমন একজন শহীদ, বীর মুজাহিদের আলোচনা করব, যিনি তোরাবোরায় আমাদেরকে সর্বোচ্চ সাহায্য করেছিলেন। তিনি হলেন, বীর শহীদ মৌলভী নূর মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহু। তিনি ছিলেন ইসলামের একজন সিংহ-পুরুষ। যিনি অনেক প্রতিকূল ও কঠিন সময়ে আমাদেরকে তার সর্বোচ্চ সহায়তা করেছেন। মৌলভী নূর মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহু ছিলেন একজন আলেম, মুজাহিদ ও পূর্ণ যুবক। জালালাবাদের 'ওয়াজির' কবিলার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তিনি। তালেবান প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি যে পদটিতে দায়িত্বরত ছিলেন, সেটিকে বলা হতো 'ওয়ালিসওয়াল'। আমরা যাকে সিটি-মেয়র বা কাউন্সিলর বলে থাকি।

অতঃপর যখন আফগানিস্তানে ক্রুসেডারদের আক্রমণ শুরু হয়, তখন তিনি মুজাহিদীনদের সাথে যোগ দেন। আমরা যখন তোরাবোরায় আসলাম, তখন এই মহান লোকটি একদল মুজাহিদ নিয়ে আমাদের সাথে এসে মিলিত হন এবং পাহাড়ে ওঠেন। অতঃপর আমাদের সাথে দেখা করেন এবং শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহু-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, "আমি আপনার আদেশের আজ্ঞাবহ। আপনার যা ইচ্ছা আমার কাছে বলুন। আমি যথাসাধ্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা দিয়ে আপনার কথা পালন করব।"

এই মানুষটি তোরাবোরার ট্র্যাজেডির পর শহীদ হয়ে যান। তিনি এবং তার ভাই পাকিস্তানের পেশোয়ারে নিহত হন। আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, আমেরিকার মুনাফিক

দালালরাই তাকে শহীদ করেছে। আল্লাহ তাদের উভয়ের ওপর অশেষ রহম নাযিল করুন।

মৌলভী নূর মুহাম্মাদ আমাদের সাথে পাহাড়ে আরোহণ করেছেন এবং আমাদেরকে সব ধরনের সাহায্য করেছিলেন। আমার মনে পড়ে, মৌলভী নূর মুহাম্মাদ এবং আরো কয়েকজন আনসার ভাই শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহু-এর কাছে এই অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তাদের এই ভ্রাতৃত্ববন্ধন অবশ্যই দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানেই থাকবে। আর আমি মহান রাব্বুল আলামিনের প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। কারণ তিনি আমাকে সেই মজলিশে উপস্থিত রেখে সম্মানিত করেছেন। আমিও তাদের হাতের সাথে আমার হাত বাড়িয়ে দিয়ে শাইখের সাথে অঙ্গীকার করেছিলাম এবং আল্লাহর কাছে কবুলিয়্যাতের প্রার্থনা করেছিলাম।

একটি মজার কথা মনে পড়ছে, মৌলভী নূর মুহাম্মাদ সে সময় আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন "আইমান আয-যাওয়াহিরী কোথায়? শুনেছি তিনি নিহত হয়েছেন!" আমি হেসে উঠে বললাম, "না তিনি জীবিত আছেন এবং সুস্থ আছেন।"

আরো মনে পড়ছে, তাকে বলেছিলাম, "মৌলভী সাহেব, আমরা এই মুহূর্তে সায়্যিদুনা হুসাইন বিন আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা-এর মতো শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত।" তিনি বলেছিলেন, "হ্যাঁ, সত্যিই আমাদের অবস্থা (এখন) হুসাইন বিন আলীর মতোই।"

তিনি আমাদেরকে অনেকভাবে সাহায্য করেছিলেন। সবচেয়ে বড় যে সাহায্যটি করেছিলেন তা হলো, তিনি জালালাবাদের স্থানীয় নেতাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। তাদের মধ্য হতে কয়েকজনকে আমাদের কাছে নিয়েও এসেছেন। এমনকি একবার একজন গোত্রপ্রধানকেও আমাদের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। যিনি তালেবান সরকারের একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা ছিলেন।

তারপর যখন মুনাফিকদের সরকার আসলো, তখনও তিনি একই পদে বহাল ছিলেন।

এটা যুদ্ধের অন্যতম আশ্চর্যজনক একটি দিক! অর্থাৎ যুদ্ধের সময় আপনি প্রকৃত বন্ধু যেমন পাবেন, তেমনই প্রকৃত শত্রু এবং মাঝামাঝি অবস্থানকারী একদলকেও পাবেন। তো আফগানিস্তানে যখন আমেরিকানরা আসলো, তখন এই লোকটিও মুনাফিক সরকারের ডেপুটি হিসেবে যোগ দেয়। কিন্তু তার মনের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা দুদিকে বিভক্ত হয়ে যায়। একদিক ছিল ক্ষমতা যা সে ছাড়তে চায়নি, অপরদিকে মুজাহিদীনদের জন্য তার ভালোবাসা।

লোকটি পাহাড় বেয়ে আমাদের কাছে উঠে আসে। তার অন্তরের মানসিক অস্থিরতা চেহারায় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহু তাকে লক্ষ্য করে বললেন "আমরা আপনার ভাই, সকলেই মুজাহিদ, মুহাজির, গুরাবা এবং মুসাফির (আফগানীদের কাছে মুসাফির অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি শব্দ)। আমরা আপনাদের আরবী ভাই। যারা আপনাদের সাথেই জিহাদে শরীক হয়েছিলেন। আপনাদের কাছ থেকে কিছুই চাই না আমরা। যুদ্ধ হচ্ছে আমাদের ও আমেরিকানদের মধ্যে। তাহলে আপনারা কেন এখানে হস্তক্ষেপ করবেন?"

শাইখের কথা শুনে লোকটি অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে বলল, "না, না! আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমার দিক থেকে আপনাদের কোনো ক্ষতি হবে না।" শাইখ বললেন, "আমরা আপনার সাহায্য চাই।" সে বলল, "আমি আপনাকে সহায়তা করব এবং রসদ সরবরাহ করব।" অতঃপর তোরাবোরার অবরোধের সময় এই লোকটিও অংশগ্রহণ করেছিল এবং একটি সেকশনের সেকশন-ইন-চার্জ ছিল।

অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে, আফগানের জনগণ সৃষ্টিগতভাবেই ক্রুসেডারদেরকে ঘৃণা করে এবং এই বলে গর্ব করে যে, "আমরাই তো সেই জাতি,

যারা ইংরেজদেরকে বিতাড়িত করেছি এবং আমাদের দেশে বসতি স্থাপন করতে দিইনি।" এমনকি তারা কাউকে গালি দিলে 'ইংরেজ' বলে গালি দিত। এমনকি কখনো তারা আমেরিকানদেরকে বাহ্যিকভাবে কোনো সহায়তা করলেও অন্তর থেকে অভিশাপ দিত।

তো এই লোকটি শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহু-কে বলল, "আমি আপনার সাথে অঙ্গীকার করছি যে, আমার পক্ষ থেকে কোনো ক্ষতিই হবে না।" শাইখও তাকে বললেন, "আমরা আপনার কাছে কিছু গোলাবারুদ এবং যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রত্যাশা করছি।" সে বলল, "হ্যাঁ, আমি আপনার প্রয়োজন পূরণ করব।" তাই সেগুলো ক্রয় করার জন্য শাইখ তাকে কিছু টাকা দিয়েছিলেন। সে বলল, "ইনশাআল্লাহ আমি আপনার জন্য তা নিয়ে আসব।" শাইখ তাকে আরো বললেন, "আমি আপনার কাছ থেকে আরো একটি সাহায্য চাই।" লোকটি বলল, "কী সেটা?" তিনি বললেন, "আপনি আপনার এলাকার আলেমদের জুমার খুতবায় সাধারণ জনগণকে আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের প্রতি অনুপ্রাণিত করতে অনুরোধ করবেন এবং তাঁরা তাদেরকে এ কথা যেন স্পষ্ট করে দেয় যে, এই আমেরিকানরা আফগান দখল করতে এসেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ওয়াজিব হয়ে গেছে।" লোকটি প্রতিজ্ঞা করেছিল। কিন্তু আমার জানা নেই, সে তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছিল কি না!

এই লোকটির সাথে আমাদের একটি বিস্ময়কর ঘটনা রয়েছে। অবরোধকালে সে একটি সেক্টর পরিচালনার দায়িত্বে ছিল। এদিকে একজন ভাই শাইখ লিবী রহিমাহুল্লাহু-এর সহযোগী হিসেবে কাজ করছিল। এই ভাইটির কথা পূর্বেও বলেছি যে, সে তোরাবোরার যুদ্ধের সময় সামরিক বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। তো এই ভাই অন্য একজন আনসার ভাইকে সাথে নিয়ে শাইখকে না জানিয়েই ওই লোকটির (যিনি আফগানের মুনাফিক সরকারের ডেপুটি ছিলেন) গ্রামের ওপর হামলা

করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আমরা যেই পর্বতশ্রেণীতে ছিলাম তার গ্রামটি সেগুলোর পাশেই ছিল।

তাই সে আনসার ভাইদের একটি দল নিয়ে নিচে নেমে যায় এবং মর্টারশেলের মাধ্যমে তার গ্রামের ওপর কয়েকটি আক্রমণ করে। আক্রমণ করে তারা ফিরে আসে। অতঃপর সেই লোকটি শাইখকে এই বলে বার্তা পাঠায় যে, "আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, আমার পক্ষ থেকে কিছুতেই আপনাদের কোনো ক্ষতি হবে না, তাহলে আমাদের ওপর আক্রমণ করা হলো কেন?"

আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে সেই শেলগুলো কারো গায়ে লাগেনি। তাই শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহু সেই ভাইকে তলব করলেন। যিনি ছিলেন মুজাহিদীনদের প্রথম সারির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। শাইখ তাকে বললেন, "ভাই, এ তুমি কী করলে?!" সে বলল, "যারা আমাদেরকে অবরোধ করে রেখেছে, আমি চেয়েছিলাম তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে।" শাইখ বললেন, "তুমি কি এ বিষয়ে আমাদের কাউকে অথবা তোমার কমান্ডারকে জানিয়েছিলে?" সে বলল, "জি না, এটা আমি নিজে নিজেই করেছি।" তিনি বললেন, "ভাই, আল্লাহকে ভয় করো। আমরা খুবই জটিল একটা অবস্থার সম্মুখীন। তুমি যদি নিজে নিজেই এভাবে কাজ করা শুরু করে দাও, তাহলে যুদ্ধের ভারসাম্য আমাদের বিপরীতে চলে যেতে পারে। যারা আমাদের অবরোধ করছে, তাদের মধ্যে আমরা সর্বদিক দিয়ে বিভাজন তৈরি করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। তাই কিছুতেই এমন কাজের পুনরাবৃত্তি করবে না।"

এটা ছিল আমাদের প্রতি মৌলভী নূর মুহাম্মাদের অনেকগুলো সাহায্যের মধ্যে একটি। তোরাবোরার শেষ মুহূর্তটি পর্যন্তও মৌলভী নূর মুহাম্মাদ আমাদের সাথে ছিলেন। তিনি যুদ্ধে অনেক বড় বড় সাফল্য অর্জন করেছিলেন। আজ প্রথমবার আমি তার অবদানের কথা আলোচনা করছি। আমেরিকানরা এটা জানত কি না

আমার জানা নেই। তবে আমি তাদেরকে ক্রোধান্বিত করার জন্য বলছি যে, মৌলভী নূর মুহাম্মাদই একমাত্র ব্যক্তিত্ব, যিনি শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহু-কে তোরাবোরার অবরোধ থেকে বের করে নিয়ে এসেছেন।

শহীদ কমান্ডার মুয়াল্লিম আওয়াল গুল রহিমাহুল্লাহু-এর কথা পূর্বে বলেছিলাম। তিনি শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহু-কে জালালাবাদ থেকে এবং মৌলভী নূর মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহু তোরাবোরার কঠিন পর্বতশ্রেণী থেকে সহজ স্থানে বের করে নিয়ে এসেছিলেন।

এটা ছিল মৌলভী নূর মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহু-এর পক্ষ থেকে মুজাহিদীনদের ওপর অনেক বড় অনুগ্রহ যে, তিনি তোরাবোরার কঠিন পাহাড়ি এলাকা থেকে শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহু-এর বের হওয়ার পথকে সহজ করে দিয়েছিলেন। তোরাবোরা থেকে বের হওয়ার সময় শাইখ সাথীদেরকে কীভাবে বিন্যস্ত করেছেন, সে বিষয়ে ইনশাআল্লাহ সামনে আলোচনা করব।

সে সময় সারা দুনিয়ার চোখ তোরাবোরার দিকে ছিল। পুরো ক্রুসেডার জোট তোরাবোরাকে ঘেরাও করে রেখেছিল। তখন আমেরিকানরা বলেছিল, “আমরা যদি উসামা বিন লাদেন ও তাঁর সাথীদের সাথে তোরাবোরায় বিজয় অর্জন করতে পারি, তাহলে আফগানিস্তানের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এবং যুদ্ধও সমাপ্ত হয়ে যাবে।” কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে এবং তাঁরই ক্ষমতায় এই ভাইদের মাধ্যমে শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহু ও সকল ভাইকে এই অবরোধ থেকে বের হতে সাহায্য করেছেন।

শাইখের তোরাবোরা থেকে বের হওয়ার ঘটনাটি অনেক দীর্ঘ। পরে তা বলব ইনশাআল্লাহ। কিন্তু তোরাবোরায় শুধু মৌলভী নূর মুহাম্মাদই আমাদেরকে সাহায্য

করেননি; বরং সেখানে আরো অনেকেই আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাদের মধ্যে সেখানকার স্থানীয় লোকজনও ছিল।

মৌলভী নূর মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহু আমাদের বলতেন, "একবার তিনি এবং তার সাথী ভাইয়েরা অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে তোরাবোরা পর্বতে উঠছিলেন। এ সময় একজন বৃদ্ধা মহিলা তাদের দেখে ফেলে। বৃদ্ধা মহিলাটি ভেবেছিল, মৌলভী নূর মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহু ও তার দল আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সেদিকে যাচ্ছে"। তিনি বলেন, "এই ভেবে বৃদ্ধা মহিলাটি আমাদেরকে বদদোয়া দিয়ে যাচ্ছিল আর বলছিল, "তোমরা আরবদের সাথে যুদ্ধ করতে যাচ্ছ?! ধিক তোমাদের জন্য! ধ্বংস হও তোমরা!"। এই বলে বৃদ্ধাটি ক্রমাগত আমাদের মৃত্যু ও ধ্বংসের জন্য অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছিল। আর আমরা চুপচাপ তা শুনছিলাম।"

মৌলভী নূর মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহু আরো বলতেন, "একবার একজন লোক তার কাছে এসে বলল, "আমি জানি, আপনি আরব ভাইদের সাথে দেখা করার জন্য তোরাবোরাতে ওঠেন। আমার কাছে এই সুদানী চিনাবাদামের বস্তাটি ছাড়া আর কিছুই নেই। আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি মুজাহিদ ভাইদের জন্য আমার পক্ষ থেকে এই বস্তাটি তোরাবোরাতে নিয়ে যান, যেন পর্বতে তাদের অবস্থান করতে এটি একটি সাহায্যের উপলক্ষ হয়।"

আরেকবার তোরাবোরার কাছাকাছি একটি মসজিদে জুমার নামাজের সময় গ্রামের একজন লোক দাঁড়িয়ে মুনাফিক কারজাই সরকারকে অভিসম্পাত করতে শুরু করল। লোকটি বলছিল, "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে ফয়সালা করবেন। বিপদাপদ অচিরেই তোমাদের পেয়ে বসবে। তোমরা পাহাড়ে অবস্থানরত যাদের সাথে যুদ্ধ করছ, তারা সাহাবীদের সন্তান। অনতিবিলম্বে তোমরা তোমাদের পরিণতি দেখতে পাবে।"

এ সময় আমাদের স্মৃতিবিজড়িত বহু ঘটনা আছে, যা হৃদয়কে নাড়া দিয়ে যায়। বস্তুত সেখানকার পুরো গ্রামবাসী আমাদেরকে সাহায্য করেছিল এবং আশ্রয় দিয়েছিল। একটি আশ্চর্যজনক বিষয় দেখেছিলাম সেখানে। আশপাশের গ্রামগুলো থেকে বিভিন্ন গোত্রপতিরা শাইখের কাছে ছুটে আসত এবং একটি স্বাক্ষরলিপি লিখে দিতে অনুরোধ করত। যাতে লেখা থাকবে যে, "যুদ্ধের সময় এই ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে, সে মুজাহিদদেরকে সাহায্য করেছে এবং সে তাঁর সেই সকল ভাইদের মধ্যে ছিল, যাদেরকে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন।" তারা আরো বলত, "আমরা এই স্বাক্ষরলিপিটি সংরক্ষণ করব এই কারণে যে, শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহু আমাদের প্রশংসা করেছেন। আমরা তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলাম এবং সাহায্য করেছিলাম।" এটি ছিল আফগানীদের এক অদ্ভুত বিষয়।

সেখানে এমন অনেক আনসারও ছিলেন, যারা মুনাফিক সরকারের কাছ থেকে কঠোর হুমকির সম্মুখীন হতেন। আপনাদেরকে হাজী দ্বীন মুহাম্মাদের ব্যাপারেও বলব। এই লোকটি জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়ে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টিই হারিয়েছে। সে সময় সম্ভবত সে জালালাবাদ সরকারের ডেপুটি গভর্নর ছিল। তো যারা আমাদের সাহায্য করত, এমন কয়েকজনকে সে এই বলে হুমকি দিয়েছিল যে, "তোমরা যদি আরবদেরকে ত্যাগ না করো, তবে আমেরিকানরা ৫০টা বিমান পাঠিয়ে তোমাদের গ্রামকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।"

আর বাস্তবেই আমেরিকা সেই গ্রামে বিমান হামলা চালিয়েছিল এবং গ্রামটিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। তার মা এবং একটি ছোট্ট বাচ্চা ছাড়া তার পরিবারের প্রায় সবাইকেই শহীদ করে দেওয়া হয়েছিল। সেই গ্রামের প্রায় ৫০ জন তাওহীদবাদী মাজলুম মুসলিমকে শহীদ করা হয়েছিল। যাদের মধ্যে ১৮ জনই ছিলেন তার বাড়ির লোকজন। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন তাদেরকে তাঁর রহমতের

চাদরে ঢেকে নেন। এত নির্যাতন সত্ত্বেও সেই আনসারী ভাইটি ও অন্যান্য আনসারী ভাই আমাদেরকে ত্যাগ করেননি। বরং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদেরকে সাহায্য করে যাচ্ছিলেন।

সেখানে আরো একটি গ্রামের লোকেরা আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিল এবং শাইখ তাদের কাছ থেকে জিহাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। তারা প্রতিজ্ঞা করে বলেছিল, "আমরা জানি, এই যুদ্ধে খুব শীঘ্রই আমাদের গ্রামের ওপর প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা চালানো হবে। তাই আমরা আপনার কাছে এই ব্যাপারে অনুমতি প্রার্থনা করছি যে, আমাদের লোকদের গ্রাম থেকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাব এবং আমরা এসে আপনার সাথে যুদ্ধ করব"।

শাইখ অনুমতি দিয়ে বললেন, "আমি আমার তরফ থেকে প্রত্যেক পরিবারকে আর্থিক সহায়তা করব, যাতে তারা হিজরত করতে পারে"। আমরা তাদেরকে সত্যবাদী বিবেচনা করেছিলাম। কারণ তারা আমাদের আশ্রয় দিয়েছিল। বিনিময়ে তারা কিছুই চায়নি। কিন্তু তারপরেই যুদ্ধ আরো ভয়ংকর রূপ ধারণ করে।

সেই দিনগুলোতে আমাদের পরিস্থিতি কেমন ছিল, তা অবশ্যই বর্ণনা করা প্রয়োজন। চারদিকে প্রচণ্ড আতঙ্ক বিরাজ করছিল। আমেরিকা ও তার দালালরা অদ্ভুতভাবে গুজব ছড়াচ্ছিল। তারা এভাবে প্রচারণা চালাতে লাগল যে, আমেরিকা সবকিছুই দেখতে পায়। তাদের কাছে এমন অস্ত্র আছে, যা দিয়ে ক্লাসিনকোভ লক্ষ্য করে আক্রমণ করলে সব গলে যায়। এমনকি ঘরের ভেতরে কী রয়েছে, তাও দেখতে পায়।

তখন তোরাবোরার দৃশ্যটা খুবই ভয়ংকর দেখাচ্ছিল। অর্থাৎ আমি নিজেই তোরাবোরা থেকে বেরিয়ে আসার পর দেখলাম, এটা একটা ভয়ংকর দৃশ্যে পরিণত হয়েছে। সেই রাতে নিক্ষিপ্ত গোলাবারুদ আর রকেট লঞ্চারগুলোর অগ্নিশিখা পুরো

এলাকাটিকে আলোকিত করে ফেলেছিল। আলহামদুলিল্লাহ, এমন কঠিন মুহূর্তেও আমরা তোরাবোরাতেই ছিলাম। আল্লাহ তাআলা আমাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করেছেন। কিন্তু বাইর থেকে যারা এই দৃশ্য দেখছিল, তারা তো ভাবছিল, এটা তো মুহাজির আরব ও তাদের সাহায্যকারীদের জন্য এক গণকবরে পরিণত হবে। এমন কঠিন ভয় ও আতঙ্কের মুহূর্তেও এই সাধারণ অসহায় মানুষগুলো আমাদেরকে নিজেদের সর্বোচ্চ বিলীন করে সাহায্য করে যাচ্ছিল।

আগেও কয়েকবার বলেছিলাম যে, আমরা এসব প্রতিকূল পরিস্থিতিতে একমাত্র আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা ও তাওহীদের শিক্ষা লাভ করেছি। বিভিন্ন পদবি ও সার্টিফিকেট-ধারী সেসব পাগড়ি পরা দাড়িওয়ালা লোক, যারা তাওহীদের ওপর পাণ্ডুলিপি রচনা করেন এবং তাওহীদের দরস দিয়ে থাকেন, তাদের উচিত আমাদের মতো এমন প্রতিষ্ঠানে এসে নতুন করে তাওহীদের দরস গ্রহণ করা। কেননা, প্রকৃতপক্ষে তাদের এসব তাওহীদ অসম্পূর্ণ। উস্তাদ শাইখ মুহাম্মাদ ইয়াসীর রহিমাহুল্লাহু বলেন, "এমনও অনেক আলেম আছেন, যারা ইলমের ক্ষেত্রে উস্তাদ হওয়ার যোগ্যতা রাখেন, কিন্তু ঈমানের ক্ষেত্রে এখনো মুনাফিকের স্তরে রয়ে গেছেন"। আল্লাহ আমাদেরকে এসব থেকে রক্ষা করুন।

আলহামদুলিল্লাহ, আমরা এই সাধারণ অসহায় মানুষগুলোর মাঝে তাওহীদ এবং তাওয়াক্কুলের প্রকৃত শিক্ষা দেখেছিলাম। বিষয়টি পরিপূর্ণ স্পষ্ট এবং সবার জানা থাকার দরকার যে – কাফেররা সর্বদাই ইসলামের শত্রু; আর মুমিন-মুসলিমরা অপর মুসলিমদের বন্ধু। এই বিষয়টি তো ইসলামের শুরুর জমানা থেকেই প্রচলিত হয়ে আসছে যে, এরা হচ্ছে মুজাহিদ, তাই আমি এদেরকে সাহায্য করব; আর এরা হচ্ছে কাফের, তাই এদের সাথে যুদ্ধ ছাড়া কোনো সহমর্মিতা প্রদর্শন করব না। এই সৃষ্টিগত গুণাবলি নিয়েই সাধারণ মানুষগুলো আমাদের সাথে কাজ করত।

আপনারা জানেন যে, সাধারণ যুদ্ধে এবং গেরিলা যুদ্ধের এই মারহালায় অর্থাৎ তীব্র আক্রমণ ও ভীতিকর পরিস্থিতিতে প্রাথমিক ধাক্কাটা অত্যন্ত ভয়ংকর। এমন কষ্ট ও সংঘর্ষের সময়েও সাধারণ মানুষগুলো আমাদেরকে সঙ্গ দিয়েছিল। তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল সাধারণ মানুষ। অর্থাৎ খুব সম্ভব তারা শুধু ইবাদতের নিয়মাবলী এবং ইসলামের মৌলিক নীতিমালা ছাড়া আর কিছুই জানত না। তাদের কোনো ডক্টরেট ডিগ্রি ছিল না; ছিল না কোনো পদ-পদবি, যা তাদের ঈমানকে কলুষিত করতে পারে এবং তাওহীদের মাঝে ফাটল তৈরি করে দিতে পারে। অন্যান্য এলাকার মুজাহিদীনরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতেন আর এই বলে আফসোস করতেন যে, "আমরাও আপনাদের কাছে আসতে চাই; কিন্তু পারছি না!"

আরো একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা হলো, ৯/১১ হামলার পর আফগানিস্তানে আক্রমণ শুরু হওয়ার পূর্বে যখন আমাদের ভাইয়েরা তোরাবোরায় তাদের ঘাঁটি নির্মাণ শুরু করলেন, তখন তারা নিজেদের জন্য কিছু প্রশাসনিক নীতিমালা নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। তারা ভাইদের জন্য জালালাবাদে একটি বাড়ির ব্যবস্থা করলেন। এটিকে তাদের জন্য একটি উপ-ঘাঁটিও বলা যেতে পারে। সেখানে চিকিৎসা, কেনাকাটা, যোগাযোগ এবং মুজাহিদদের প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা ছিল। মাঝে মাঝে ভাইয়েরা এখানে ছুটিরও ব্যবস্থা করতেন। এছাড়াও জালালাবাদে কেবল আরবদের জন্য একটি অতিথিশালা ছিল।

অতঃপর যখন মুনাফিকদের হাতে জালালাবাদের পতন হয়, তখন ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদীনরা বেরিয়ে যান। কারণ, তারা সম্মুখযুদ্ধ পরিহার করে গেরিলাযুদ্ধের পথ বেছে নেন এবং শহর ত্যাগ করে পাহাড় ও গ্রামে ছড়িয়ে পড়েন। এটিই ছিল মুজাহিদদের জন্য একটি সফল কৌশল। যার মাধ্যমে তারা ক্রুসেডার জোটকে ধ্বংস করতে সক্ষম হন এবং আমেরিকাকে পরাজয় স্বীকার করতে ও

আফগানিস্তান থেকে বের হওয়ার পথ খুঁজতে বাধ্য করেন। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন ইসলামী ইমারতকে পুনরায় ফিরিয়ে দেন এবং আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর কান্দাহারের ইমারাহ ভবনটিতে পুনরায় ফিরে আসতে পারেন। আল্লাহর নিকট আরো প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে আমিরুল মুমিনীনের হাতে বাইয়াত নবায়ন করে সম্মানিত করেন। (উল্লেখ্য, এই আলোচনার সময় আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রহ. জীবিত ছিলেন)।

আপনারা জানেন, মুনাফিকরা জালালাবাদে প্রবেশ করেই আরব মুজাহিদদেরকে খুঁজতে থাকে, তাদেরকে আমেরিকার কাছে হস্তান্তর করার জন্য। খুঁজতে খুঁজতে একদল সশস্ত্র মুনাফিক আরবদের জন্য নির্ধারিত সেই অতিথিশালায় প্রবেশ করে। সেখানে দায়িত্বরত একজন প্রহরী ছিলেন। যাকে আমরা ধার্মিক বলেই ধারণা করি। মুনাফিক বাহিনী তার কাছে ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে সে বাধা দেয়। কারণ ভেতরে একজন ভাই ছিলেন। যিনি জালালাবাদের পতনের খবর তখনও জানতেন না। মুনাফিকরা ভাবল, ঘরে ঢুকে আরব মুজাহিদ কাউকে পেলে আমেরিকানদের হাতে সোপর্দ করা যাবে। (আল্লাহ তাআলা সেই প্রহরী ভাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন।) প্রহরী ভাইটি তাদেরকে ঘরে ঢুকতে না দিয়ে তাদের সাথে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। তার ইচ্ছা ছিল, তর্কের কারণে ভেতরে অবস্থানরত ভাই পরিস্থিতি আঁচ করে যেন পালিয়ে যেতে পারেন। অবশেষে ভাইটি তা-ই করলেন। দেয়াল টপকিয়ে কয়েকটি বাড়ি পার হয়ে গেলেন।

এভাবে তিনি একটি বাড়িতে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত হওয়া পর্যন্ত মুরগির খাঁচায় লুকিয়ে ছিলেন। এই ঘটনার পর অন্যান্য ভাই তাকে জীবন্ত শহীদ বলে ডাকতেন। অবশেষে পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার পর তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে জালালাবাদের রাস্তায় হাঁটতে থাকেন। কারণ, তিনি জানতেন না, কোথায় যাবেন? তিনি বলেন, “আমি একটি

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকি। মানুষ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তাদের তাকিয়ে থাকা দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছিলাম যে, তারা কেন আমার দিকে এভাবে তাকিয়ে আছে! কিছুক্ষণ পরেই তাদের বিস্ময়ের কারণ অনুভব করতে পারলাম। কারণ, সেই রাস্তাটি বন্ধ ছিল এবং তারা সবাই ছিল ওই মহল্লারই বাসিন্দা। আর তাদের দৃষ্টিতে আমি একজন আগন্তুক ছিলাম। তাই সকলে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে এই ভেবে যে, লোকটি যাচ্ছে কোথায়?”

রাস্তা বন্ধ দেখে ভাইটি হতবাক হয়ে পড়ে। তারপর সেখানকার একজন বাসিন্দা তাকে দেখে বলল, “এদিকে আসুন।” অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করল যে, “আপনি কোথায় যাচ্ছেন?” তিনি কোনো এক বন্ধুর কাছে যাচ্ছেন বলে উত্তর দিলেন। লোকটি তাকে নিয়ে তার বাড়িতে প্রবেশ করলেন এবং তাকে বললেন, “আমি জানি যে, আপনি একজন আরব এবং আপনি এখান থেকে বের হওয়ার পথ খুঁজছেন। এখন রাত্রিবেলা। আর রাতের বেলায় আপনি বের হতে পারবেন না। বরং সকাল পর্যন্ত আমার এখানে অবস্থান করুন। ইনশাআল্লাহ, যতক্ষণ আমি জীবিত আছি, ততক্ষণ আপনার কিচ্ছু হবে না। আর যদি মারা যাই, তাহলে আল্লাহ আপনার দেখাশুনা করবেন।” এই আচরণে মুগ্ধ হয়ে ভাইটি তার জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর বললেন, “আমি দেখলাম যে, তার ছেলে তালেবানদের প্রতিষ্ঠিত একটি দ্বীনি মাদরাসায় পড়ে। তো তাকে দেখে আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ, এটা তালেবানদেরই কাজের বরকত। আল্লাহ আমাকে তালেবানদের বরকতে উপকৃত করেছেন।”

ভাইটি তার সাথে সকাল পর্যন্ত অবস্থান করলেন। অতঃপর সকালে লোকটি তাকে একটি রাস্তা দেখিয়ে বলেন, “আপনি এই পথে যেতে থাকুন। তাহলে তোরাবোরায় গিয়ে উঠতে পারবেন।” ভাইটির দোকান থেকে কিছু জিনিস ক্রয় করার

প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তিনি দোকানে যান। দোকানদার ভাইটিকে আরবের বুঝতে পেরে তার দিকে তাকিয়ে রইল। অতঃপর কেনাকাটা শেষে ভাইটি যাওয়ার সময় সে পেছন থেকে তার দিকে তাকিয়ে দেখছিল যে, এই আরব লোকটি যাচ্ছে কোথায়?" তিনি বলেন, "তখন আমি ভুল পথে যাচ্ছিলাম। কিন্তু দোকানদারকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি। অতঃপর দোকানদার আমাকে ডেকে বললেন, "আপনার পথ এদিকে।" আজ এখানেই সমাপ্ত করলাম।

# পর্ব ৬

এটি ইমামের সাথে অতিবাহিত দিনগুলো সিরিজের (أيام مع الإمام)-এর ৬ষ্ঠ পর্ব। এ পর্বে আমি ইমামুল জিহাদ, মুজাদ্দিদ, যুগশ্রেষ্ঠ বীর শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ'র সাথে আমার আরো কিছু স্মৃতিচারণ করব। আল্লাহ তাঁর ওপর রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন।

বিগত দুই পর্বে তোরাবোরা ও সেখানে কাটানো দিনগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং শত্রু-মিত্র সম্পর্কেও কিছু কথা বলেছি। প্রথমে বন্ধু ও মিত্রদের নিয়ে আলোচনা করেছি। সেখানে শ্রদ্ধেয় শাইখ মুজাহিদ মুহাম্মাদ ইউনুস খালিস রহিমাহুল্লাহ, কারী আবদুল আহাদ রহিমাহুল্লাহ, মুয়াল্লিম আওয়াল গুল রহিমাহুল্লাহ এবং মৌলভি নুর মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহ-কে নিয়ে অনেক স্মৃতিচারণ করেছি। আল্লাহ তাঁদের ওপর অবারিত রহমত বর্ষণ করুন।

গত পর্বগুলোর মতো এ পর্বেও শহীদদের নিয়ে স্মৃতিচারণ করব ইনশাআল্লাহ। আর যে সকল গাজি ভাই পর্যাপ্ত সাহায্য-সহযোগিতা করার পাশাপাশি আমাদেরকে অনেক সম্মান ও শ্রদ্ধা করেছেন, আল্লাহ চান তো তাদের সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

আমাদের প্রতি তাঁদের অনুগ্রহ এবং সদাচারের কথা কখনো ভুলব না। ভুলে যাব না জিহাদ ও জিহাদি আন্দোলনের জন্য তাঁদের অসামান্য খেদমত ও বিরাট অবদানের কথা। আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমি তাঁদের উদ্দেশ্যে বলব, আপনারা আমাদের চোখের মণি, আমাদের সেরেতাজ, আপনাদের অনুগ্রহের কথা কখনো বিস্মৃত হবে না। ইনশাআল্লাহ, অচিরেই এমন সময় আসবে, যখন আল্লাহর ইচ্ছায় আপনাদের নিয়ে মনভরে আলোচনা করব।

বন্ধুবর ও প্রিয় সাথীদের আলোচনা শেষে এখন তোরাবোরার শহীদদের সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোকপাত করব এবং সে শহীদদের নিয়েও আলোচনা করব, যারা তোরাবোরা যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু পরবর্তী সময়ে শাহাদত বরণ করেছেন।

মূল আলোচনায় আসি। শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ'র পরিকল্পনা এবং সুড়ঙ্গ খননে তাঁর প্লান ও দক্ষতার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করছি। বাঙ্কার ও সুড়ঙ্গের কল্যাণে আল্লাহর ইচ্ছায় ভাইদের মাঝে হতাহতের সংখ্যা অনেক কম ছিল। কারণ ভাইদের হতাহতের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে শতকরা দশ বা বারো-তেরোজন পর্যন্ত পৌঁছেছিল। তোরাবোরায় ভাইয়েরা যে ভয়াবহ বোমাবৃষ্টির মাঝে পড়েছিলেন এবং নির্দয় অবরোধে ফেঁসে গিয়ে যে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেই তুলনায় হতাহতের এ সংখ্যা ছিল অত্যান্ত নগণ্য।

বাঙ্কার ও সুড়ঙ্গ খননের ব্যাপারে শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ'র দক্ষতা ছিল অসাধারণ। এটি এমনই এক সূক্ষ্ম রাজনৈতিক পদক্ষেপ, যা প্রত্যেক অঞ্চলের

মুজাহিদ ভাইদের অনুসরণ করা উচিত। কেননা, জায়নবাদী ক্রুসেডাররা আমাদের সাথে আকাশপথের কর্তৃত্ব আর ক্ষমতার দাপট দেখায়। এই বাঙ্কার ও সুড়ঙ্গ আকাশপথের কর্তৃত্বের মোকাবেলায় বেশ উপযুক্ত একটি পন্থা। তাই আমার জোর নির্দেশ হচ্ছে, প্রত্যেক সেক্টরের মুজাহিদ ভাইগণ বাঙ্কার ও সুড়ঙ্গ খননে বিশেষ গুরুত্ব দেবেন এবং এ ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্ব ও সৃজনশীলতা অর্জন করবেন। তাহলে আল্লাহ চান তো, শত্রুর আকাশপথে হামলার আশঙ্কা অনেক কমে আসবে।

এখন যে সকল শুহাদার আলোচনা শুরু করব, তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি বীর মুজাহিদ, শাইখ ইবনুশ শাইখ লিবি রহিমাহুল্লাহ'র কথা উল্লেখ করব। জিহাদি আন্দোলনের ইতিহাসে এই মহান মানুষটি সুদৃঢ় পর্বততুল্য। তিনি রুশ-বিরোধী জিহাদের সময় থেকেই জীবনের পুরো সময় জিহাদের খেদমতে ওয়াকফ করে দিয়েছেন। জিহাদি আন্দোলন এবং মুজাহিদ ভাইদের জন্য কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই নিজের সর্বোচ্চ কোরবানি পেশ করেছেন। অবশেষে আল্লাহর রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে আমি পূর্বেও বলেছি। তাঁর ব্যাপারে শাইখ উসামার প্রশংসার কথাও উল্লেখ করেছি। কিন্তু এখন তোরাবোরার বীরদের সঙ্গে তাঁর আলোচনাও উল্লেখ করব।

তিনি এবং খালদুন ক্যাম্পের তাঁর অন্যান্য সাথীরা ছিলেন একটি বিদ্যাপীঠের মতো। তাঁদের এই ক্যাম্প ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয়। যখন রাশিয়া আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যায়, জিহাদি দলগুলো আন্তঃদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং অনেক মুজাহিদ আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যায়, তখন শাইখ ইবনুশ শাইখ লিবি রহিমাহুল্লাহ ও তাঁর সাথীদের কর্মতৎপরতা হয়ে যায় আফগানিস্তানে থেকে আফগান ভূমিকে সকল জিহাদি জামাআতের মুজাহিদ ভাইদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা। তাঁদের এই বরকতময় কাজ জিহাদের ময়দানগুলোতে অনেক সুফল বয়ে আনে। তাঁদের খালদুন

ক্যাম্প শুধু প্রশিক্ষণ শিবিরই ছিল না, বরং তাঁরা সেখানে একটি স্বতন্ত্র দাওয়াহ বিভাগ চালু করেছিলেন, যেখানে দরস দিতেন শাইখ আবু আবদুল্লাহ আল-মুহাজির হাফিজাহুল্লাহর মতো ব্যক্তি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অচিরেই তাঁর সাথে একত্রিত করুন। শাইখ ইবনুশ শাইখ লিবি যেমনিভাবে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর পথে একজন উৎসর্গিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তেমনিভাবে ছিলেন এই মাদরাসার অগ্রদূত। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহয় যেমন নিবেদিত প্রাণ ছিলেন, তেমন কঠিন দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে ছিলেন দৃঢ়তার এক আদর্শ পুরুষ। সামনে তাঁর যুদ্ধসংক্রান্ত অভিজ্ঞতার কথা আলোচনায় আসবে ইনশাআল্লাহ। তিনি অত্যন্ত পারদর্শী যোদ্ধা ছিলেন। তোরাবোরায় সামরিক কমান্ডার ছিলেন। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে স্বল্প সরঞ্জাম নিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

প্রথমে আমি শাইখের দৃঢ়তার কথা আলোচনা করব এবং দৃঢ়তার উদাহরণস্বরূপ দুটি উজ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরব। এর মধ্যে একটি পূর্বেও বলেছিলাম। তা হলো, তিনি এবং অন্যান্য মুজাহিদ ভাইয়েরা অবরোধ থেকে মুক্ত হয়ে নিরাপদে পাকিস্তানে সরে যেতে সক্ষম হলেন। পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে চলে গেলেন। সেখানে তিনি বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে বন্দি হলেন। পাকিস্তানের নিরাপদ এলাকায় পৌঁছার পরে সেখানের এক কবিলা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের হাতে তুলে দেয়।

অথচ তোরাবোরায় কঠিন অবরোধ এবং অনবরত বোমা বর্ষণ সত্ত্বেও আমেরিকা সেখানে কিছুই করতে পারেনি। অতঃপর যখন তাঁরা তোরাবোরা থেকে বের হয়ে নিরাপদে পাকিস্তানে চলে গেলেন। সেখানকার গোত্রগুলো গোত্রের নীতি অনুযায়ী তাঁদেরকে নিরাপত্তা দিল আর তাঁরাও এতে আশ্বস্ত হলেন। তখন পাকিস্তান সরকার বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী অপ্রত্যাশিতভাবে এসে ভাইদের

ঘেরাও করে এবং তাঁদেরকে বন্দি করে। 'কুহাত' জেলে—যে কথা আমি আগেও বলেছি—পাকিস্তানি প্রতারক অফিসাররা শাইখের সাথে দরকষাকষির চেষ্টা করে। তারা চাইছিল শাইখ ইবনুশ শাইখ লিবির সাথে থাকা অর্থগুলো ছলে বলে কৌশলে নিয়ে যাবে। অন্যান্য সাথীদের দেখাশোনা ও পরিচালনার জন্য শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ তাঁকে বেশ কিছু অর্থ দিয়েছিলেন। সেগুলো তাঁর সাথেই ছিল। (তোরাবোরা থেকে বের হওয়ার ঘটনা আলোচনা করার সময় বিষয়টি বিস্তারিত তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ)। এ অফিসাররা তাঁর কাছ থেকে এগুলো বাগিয়ে নিতে চাইছিল। ফলে তারা এভাবে দরকষাকষি শুরু করল যে, আমরা আপনাকে এই সমস্যা থেকে বের করে দেবো এবং পলায়নের ব্যবস্থা করে দেবো। তবে শর্ত হলো এই অর্থগুলো আমাদেরকে দিয়ে দিতে হবে। পুরো ঘটনাটি এমনভাবে আমরা করব, যেন আপনাকে আমরা বন্দিই করিনি। শাইখ রহিমাহুল্লাহ (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন) এই সংকটময় মুহূর্তে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি বললেন, 'আমি তোমাদেরকে এই সম্পদের দ্বিগুণ সম্পদ দেবো। যদি আমার সাথে আমার সকল ভাইকে ছেড়ে দাও। শুধু আমাকে ছাড়লে হবে না।' উত্তরে তারা বলল, 'না! এই প্রস্তাব গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি না।' অবশেষে তিনি ভাইদের সাথেই জেলে থেকে গেলেন। কী অতুলনীয় সেনাপতি তিনি! কত উত্তম আদর্শবান ব্যক্তি!!

শাইখ ইবনুশ শাইখ লিবি রহিমাহুল্লাহ'র সুউচ্চ মনোবল এবং দৃঢ়তার আরেকটি দৃষ্টান্ত। আবু ইয়াহইয়া রহিমাহুল্লাহ এই ঘটনাটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা দুজনেই বন্দি হওয়ার পর আফগানিস্তানের একটি কারাগারে ছিলেন। তো আবু ইয়াহইয়া রহিমাহুল্লাহ আমাকে বললেন, 'যখন আমেরিকার তদন্তকারীরা তাকে জিজ্ঞেস করল যে, "আপনি কি আল-কায়েদার সদস্য?" অবশ্য শাইখ রহিমাহুল্লাহ

আল-কায়েদার সদস্য ছিলেন না। তিনি উসামা বিন লাদেনের কাছে বাইয়াতপ্রাপ্ত ছিলেন না। আমি আগেও বলেছি, শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ ছিলেন একজন বিস্ময়কর মানুষ। তিনি ইসলামি ও জিহাদি দলগুলোর সদস্যদের কাজে লাগাতেন, চাই তারা তাঁকে বাইয়াত দিক বা না দিক। শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ'র মর্যাদা ও মহৎ গুণাবলির আলোচনায় বলেছিলাম, তিনি পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। ইসলামি দলগুলো থেকে সর্বাত্মকভাবে দ্বীনের খেদমত নিতেন। তানজীমি বা সাংগঠনিকভাবে তাদের যোগদান করা ছাড়াই বিভিন্ন কাজ দিয়ে রাখতেন। শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ চুম্বকের মতো সকলকে একত্র করে বিভিন্ন ফলপ্রসূ প্রকল্পে লাগিয়ে রাখতেন। শাইখ ইবনুশ শাইখ লিবি রহিমাহুল্লাহ আল-কায়েদাতে ছিলেন না। কেননা, তখন তিনি শাইখ উসামার কাছে তখনো বাইয়াতপ্রাপ্ত নন। যাই হোক, তদন্তকারীরা যখন বলল, 'আপনি কি আল-কায়েদার সদস্য?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। আমি আল-কায়েদার সাথেই আছি।' শাইখ আবু ইয়াহইয়া রহিমাহুল্লাহ তাঁকে বললেন, 'আপনি তো নিজেকে জটিলতায় ফেলে দিয়েছেন!' তিনি বললেন, 'না। তাদের  সামনে আমি আল-কায়দা থেকে আলাদা হতে চাইনি। আল-কায়েদা হলো সম্মান ও মর্যাদার অপর নাম। আল-কায়েদা থেকে আমি আলাদা হবো না। আমি তাদের সামনে ভীত হবো না। আমি আল-কায়েদার সাথে না থাকলেও আল-কায়েদাকে নিয়ে গর্ব করি।' শাইখের আলোচনা এই পর্যন্ত। আল্লাহ তাআলা তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

আর তোরাবোরা যুদ্ধে শাইখ ইবনুশ শাইখ লিবি'র অংশগ্রহণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বলব।

শাইখ ইবনুশ শাইখ লিবি রহিমাহুল্লাহ ছিলেন তোরাবোরার সামরিক কমান্ডার। তাঁর সাথে ছিল অল্প কিছু সরঞ্জাম, যা এই ক্রুসেডার জোটের সামনে উল্লেখ করার মতো

নয়। আমরা দেখেছি, ফ্রান্সের ডাসাল্ট মিরেজ এবং আমেরিকার বি৫২ বিমানসহ বিভিন্ন জঙ্গি বিমান কীভাবে তোরাবোরায় বোম্বিং করেছে। সেগুলো একের পর এক তোরাবোরাতে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছিল। সে সময় আফগান-যুদ্ধ প্রায় শেষ পর্যায়েই ছিল। তোরাবোরা ছাড়া আর কিছুই ধ্বংস করার মতো ছিল না। পুরো বিশ্বের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তোরাবোরার দিকে। সংবাদ সংস্থাগুলো তোরাবোরার বাইরে অপেক্ষমাণ ছিল। আর এদিকে আরব মুজাহিদরা কেউ বন্দি হচ্ছিল আর কেউ নিহত হচ্ছিল। বুশ ভেবেছিল, যদি তোরাবোরার এই স্বল্প সংখ্যক মুজাহিদদেরকে এবং শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ-কে ধরে ফেলতে পারে, তখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে এবং তারা আফগান-যুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে পারবে। এরপর ইরাক-যুদ্ধের দিকে মনোনিবেশ করবে। সারা পৃথিবী অধীর আগ্রহে তাকিয়ে ছিল যে, ঘটনা কোন দিকে মোড় নেয়! কারণ, সমগ্র খ্রিষ্টানজোট একত্রে তোরাবোরায় হামলারত ছিল। তো, শাইখ ইবনুশ শাইখ লিবি রহিমাহুল্লাহ'র সাথে অল্প কিছু সরঞ্জাম ছিল। অন্যান্য মুজাহিদ ভাইদের কাছে ছিল হালকা কিছু অস্ত্র। তবে একটি গোপন তথ্য প্রকাশ করছি, তোরাবোরায় ভাইদের সাথে যে অস্ত্র ছিল, সেটা কেবল একটি মর্টার মাত্র—এই বিশাল বাহিনীর মোকাবেলায়। কীভাবে যে বলব? অর্থাৎ একদিকে অস্ত্রের পাহাড়, বিপুল যুদ্ধ সরঞ্জাম, বিমানের বহর, বিশাল সৈন্যবহর। যারা মুহূর্তের মধ্যে তোরাবোরা পাহাড়কে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে চাচ্ছে। এই একটি মর্টার গান দিয়ে, হ্যাঁ, শাইখ ইবনুশ শাইখ লিবি রহিমাহুল্লাহ এই একটি মাত্র মর্টার দিয়েই তোরাবোরা অভিমুখে মুনাফিকদের অগ্রযাত্রা রুখে দিয়েছিলেন।

আমি পূর্বেও বলেছি, মার্কিনিরা চূড়ান্ত পর্যায়ের ভীরু এবং কাপুরুষ। তারা এতটাই ভীতু যে, তোরাবোরায় নিজেরা হামলা করার দুঃসাহস করতে পারেনি। তারা বুঝতে পেরেছিল, যারা তোরাবোরায় অবস্থান করছে, তাঁরা বুকে প্রাণ থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ

করার সংকল্প করেছে। ফলে তারা নিজেরা সাহস না করে মুনাফিক বাহিনীগুলোকে এগিয়ে দিচ্ছিল। যখনই মুনাফিকদের একটি ব্যাটেলিয়ানকে লড়াইয়ের জন্য অগ্রে পাঠাত, তখনই তাদের অধিকাংশ লাশ হয়ে যেত এবং বাকিরা আহত হয়ে ফিরে যেত। এভাবে তারা আসছিল আর লাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছিল। আল্লাহ তাআলা তোরাবোরাতে আক্রমণকারী এ সকল মুনাফিকের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। (ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে পরবর্তী সময়ে অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা উল্লেখ করব।)

শাইখ ইবনুশ শাইখ লিবি রহিমাহুল্লাহ অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রথমে তাঁর ফায়ার পয়েন্টসমূহ, মেশিনগানগুলো এবং মর্টারটি শত্রুদের থেকে আড়াল করে রেখেছিলেন। যে বিমানগুলো দীর্ঘ ১৪ দিন ধরে তোরাবোরায় হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছিল, সেগুলো থেকে ফায়ার পয়েন্টগুলো গোপন করে রেখেছিলেন। যখনই মুনাফিকদের কোনো ব্যাটেলিয়ান এগিয়ে আসত, তখনই তারা মুজাহিদদের গোপন ফায়ার পয়েন্টের আওতায় পড়ে যেত। ফলে তারা লাশ কিংবা আহত হয়ে ফিরে যেত। তারপর অন্য একটি ব্যাটেলিয়ান গ্রুপ বোমা ফেলতে ফেলতে সামনে এগিয়ে আসত। এত পরিমাণে বোমা নিক্ষেপ করত যে, তারা ধারণা করে নিত, প্রতিরোধকারী মুজাহিদদের শেষ করে ফেলেছে। তারপর অন্য একটি মুনাফিকদল আসত। শাইখ ইবনুশ শাইখ লিবি রহিমাহুল্লাহ ও তাঁর সাথীরা তাদের প্রতিহত করতেন। এভাবেই তোরাবোরার যুদ্ধ চলতে থাকে। অবশেষে মুজাহিদরা তোরাবোরা থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন।

আল্লাহ তাআলা শাইখ ইবনুশ শাইখ লিবি রহিমাহুল্লাহ-কে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তিনি ধৈর্য, অভিজ্ঞতা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে মুনাফিকদের প্রত্যেক হামলার জবাব দিয়েছিলেন।

আমি পূর্বেও বলেছি যে, শাইখ ইবনুশ শাইখ লিবি রহিমাহুল্লাহ অঙ্গীকার পূরণে ছিলেন একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষ। সম্ভবত এই পর্বগুলোতে আমি শাইখ উসামার সাথে তাঁর ওয়াদা পূরণের কথা উল্লেখ করেছিলাম। একবার প্রায় একশজনের মতো মুনাফিক এক উপত্যকায় ভাইদের রেঞ্জের ভেতরে চলে আসে। কিন্তু মুনাফিকরা তাদের কাছে নিরাপত্তা চায়। শাইখের সাথীরা মুনাফিকদের হত্যা করতে যাবেন, এমন সময় শাইখ তাদের হত্যা করতে নিষেধ করে দেন। কেননা, শাইখ তাদের নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। এটি ছিল শাইখের যুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার অন্যতম প্রমাণ। এমন পরিস্থিতিতে সাথীদের তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিলেন।

তোরাবোরার একটি মজার ঘটনা হলো, ভাইয়েরা সংবাদ বিনিময়ের সময় এই মর্টারটিকে খচ্চর বলে উল্লেখ করতেন। একদিন এক ভাই শাইখকে ডেকে বলছিল, ‘হে ইবনুশ শাইখ, হে ইবনুশ শাইখ! খচ্চরের তো খাবার শেষ হয়ে গেছে।’ শাইখ বললেন, ‘চুপ করো। কথা বলো না।’ ভাইটির কথার অর্থ ছিল, ‘মর্টারের গোলা-বারুদ শেষ হয়ে গেছে।’

আলহামদুলিল্লাহ, চিন্তা করুন। এই সামান্য যুদ্ধ-সরঞ্জাম নিয়েই অল্প কিছু মুজাহিদ—যাদের সংখ্যা প্রায় ৩০০ জনের মতো—তারা বিশ্বের সুপারপাওয়ারের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন! হ্যাঁ, আল্লাহ তাঁর সিদ্ধান্তে বিজয়ী হবেনই, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বুঝতে পারে না।

এ ঘটনায় একটি শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এই দাম্ভিক ও অহংকারী শক্তির সামনে নির্ভীক চিত্তে টিকে থাকলে বিজয় আসবেই। কারণ, বাতিল শক্তি তো হচ্ছে সর্বোচ্চ কিছু দুনিয়াবি সরঞ্জাম আর এমন কিছু মানুষ, যারা ভীতু এবং নিজের জীবনের ভিখারী। অপরদিকে যদি তুমি নিজেকে আল্লাহর হুকুমের সামনে সোপর্দ করো এবং

আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার সিদ্ধান্ত নাও, তাহলে তারা তোমার সাথে কিই-বা করবে? কিছুই করতে পারবে না। সর্বোচ্চ তোমাকে হত্যাই করতে পারবে।

হাস্যকর বিষয় হলো, 'ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, পেনসিলভানিয়ার বরকতময় হামলাগুলো যখন সংঘটিত হলো, তখন আমেরিকা বরাবরের মতো এবারও এ হামলাগুলোকে বেসামরিক লোকদের বিরুদ্ধে বলে প্রচার করেছিল। সে সময় ওয়াশিংটনে অবস্থিত তাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পেন্টাগনেও হামলা হয়েছিল। কিন্তু সেই কথা তারা উল্লেখ করেনি। আল্লাহর রহমতে এই মোবারক হামলায় বিশ্বের প্রধান সামরিক কেন্দ্রস্থলকেও ধ্বংস করা হয়েছিল।

প্রিয় ভাই, বীর শহীদ তারেক আনোয়ার রহিমাহুল্লাহ'র কথা বলছি। এই হামলার পর কাবুলে তিনি আমাকে বললেন, 'শাইখ, আমেরিকা এখন আমাদের সাথে কী আচরণ করবে?' আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম! তারা তা-ই করবে, যা তারা আগে থেকে করে আসছে। কিন্তু তারা যা-ই করুক, তাতে আমাদের কিই-বা ক্ষতি করতে পারবে?' তিনি বললেন, 'তারা আমাদের ওপর পারমাণবিক বোমা ফেলবে! আমরা তখন কী করব?!' আমি বললাম, 'আমরা কী করব! সর্বোচ্চ এটাই হবে যে, আমরা মরে যাব।' তিনি বললেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন।' এরপর হেসে দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা মরে যাব। কারণ মুমিনের কাছে জীবন আর মৃত্যু দুটোই সমান। সবার একটাই উদ্দেশ্য, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। মৃত্যু কখন আসবে আর কখন আসবে না এটা তার ভাববার বিষয় নয়। এটা তার কাজও নয়। তার কাজ হলো, একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে খুশি করা।' তোরাবোরায় এই শিক্ষাটাই স্পষ্টভাবে অর্জন হয়েছে।

যাই হোক, আমরা খচ্চর ও তার খাবারের গল্পে ফিরে যাই। এই সাধারণ কিছু অস্ত্র নিয়েই শাইখ ইবনুশ শাইখ লিবি রহিমাহুল্লাহ মুনাফিক আর খ্রিষ্টানদের বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।

তোরাবোরার পরে শাইখ ইবনুশ শাইখ লিবি রহিমাহুল্লাহ পাকিস্তানে বন্দি হলেন। আফগানিস্তানের বিভিন্ন জেলে বহু দিন পর্যন্ত বন্দি থাকেন। অতঃপর আরো বেশি টর্চার করার জন্য ওরা শাইখকে একটি কফিনে করে মিসরে নিয়ে যায়। মিসরের ক্ষমতার মসনদে তখন উমর সুলায়মান নামের কুকুর শাসক ছিল। আল্লাহ তাকে তার প্রাপ্য অনুযায়ী শাস্তি দান করুন। শাইখকে সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা সেলে নিয়ে নির্যাতন করে তারা। তিনি সেখানে নির্যাতনের ঘটনাগুলো শাইখ আবু ইয়াহইয়া লিবির কাছে বর্ণনা করেন। মিসরীরা শাইখের কাছে এমন কিছু তথ্য চাচ্ছিল, যা দিয়ে তারা আমেরিকাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে। তারা শাইখকে রাসায়নিক অস্ত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। অথচ আমাদের কাছে কোনো রাসায়নিক অস্ত্র ছিল না। তাদের নির্যাতনের চাপে পড়ে শাইখ বলেছেন যে, 'আমাদের কাছে রাসায়নিক অস্ত্র আছে।' হ্যাঁ, তাদেরকে খুশি করার জন্য তিনি এমনই বলেছিলেন। তারা যেমন তথ্য চেয়েছিল, শাইখ তাদেরকে তেমনই তথ্য দিয়েছিলেন। যাতে তারা শাইখের ওপর নির্যাতন বন্ধ করে। এমন একটি তথ্য পেয়ে তারা খবরটা খুব প্রচার করতে লাগল। অপরদিকে আমেরিকা মিসরীদের ওপর খুশি হয়ে গেল এবং পুরো বিশ্বে এ খবর ফলাও করে প্রচার করল। তারা প্রচার করল, আল-কায়েদার কাছে রাসায়নিক অস্ত্রসহ আরো অনেক অস্ত্র আছে। তাদের ওপর হামলার সময় আমরা তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি।

মিসর প্রশাসন ছেড়ে দিলে তাঁকে আমেরিকার কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। তারা তাঁকে রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'আমাদের কাছে

কোনো রাসায়নিক বা এ জাতীয় বড় কোনো অস্ত্র নেই। সেখানে আমার ওপর তারা অত্যাচার করছিল। আমার থেকে এমন একটি স্বীকারোক্তি আদায় করতে চাপ প্রয়োগ করছিল। তাই তাদের চাহিদা অনুযায়ী এই কথাটি বলেছিলাম।' এই ঘটনাটি ছিল বুশ প্রশাসনের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক ব্যাপার। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছিত করুন।

তারপর আমেরিকা শাইখকে লিবিয়ার কারাগারে স্থানান্তর করে। তারা দাবি করত যে, শাইখ ও তার সাথীরা গাদ্দাফির শত্রু। তাঁরা লিবিয়াকে গাদ্দাফির দখল থেকে মুক্ত করতে চায়। ওরা ছিল গাদ্দাফির মিত্র। লিবিয়ার কারাগারে অবস্থানকালে একটি মানবাধিকার সংস্থা শাইখের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে। আমার ধারণামতে সেটি হয়তো 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ'ই হবে। তারা এসে বলে, 'আমরা আসলে আপনার ওপর ওদের নির্যাতনের ঘটনাটি বিস্তারিত জানার জন্য এসেছি। আমেরিকা ও লিবিয়ার কারাগারে আপনি কী কী নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন?' তিনি তাদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তিরস্কারের সুরে বললেন, 'আপনারা এখন এসেছেন?! আমার ওপর সব ধরনের নির্যাতন করার পর আপনাদের আসার সময় হলো! এখন নির্যাতনের কথা জিজ্ঞেস করার সময় হলো! চলে যান আপনারা! আপনাদের কাছে আমি কিছুই চাই না।'

শাইখ ইবনুশ শাইখ আল-লিবি রহিমাহুল্লাহ-কে লিবিয়ার কারাগারে শহীদ করা হয়। ধারণা করা হয়, তাকে শহীদ করার কারণ হলো, গাদ্দাফি তাঁর ওপর যেসব দোষ চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল, তিনি সেগুলো মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন। আল্লাহ শাইখ ইবনুশ শাইখ লিবি'র ওপর রহম করুন। তিনি জিহাদের ইতিহাসে লিবিয়া এবং মুসলিম বিশ্বে সুউচ্চ ও সুদৃঢ় পর্বততুল্য একজন বীর ছিলেন।

শাইখের সম্পর্কে যে কথা বলে আমি শেষ করতে চাই তা হলো, শাইখের এই রক্ত বিশেষ করে লিবিয়ার ভাইদের কাছে আর ব্যাপকভাবে সকল মুসলিমের কাছে আমানত। শাইখ ইবনুশ শাইখ আল-লিবি, শাইখ ইয়াহইয়া আল-লিবি, শাইখ আতিয়াতুল্লাহ আল-লিবি রহিমাহুল্লাহ-সহ তাগুতের হাতে শহীদ হওয়া অন্যান্য সকল মুজাহিদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার দায়িত্ব আমি লিবিয়ার ভাইদের ওপর অর্পণ করছি। এটা সর্বপ্রথম আপনাদের কাছে একটি পবিত্র আমানত। তারপর সকল মুসলিম ও মুজাহিদদের কাছে আমানত। সুতরাং আপনাদের কর্তব্য এ বীরসেনানীদের হত্যার প্রতিশোধ নেয়া।

শাইখ ইবনুশ শাইখ আল-লিবি রহিমাহুল্লাহ-ই কেবল একমাত্র শহীদ নন বরং তাঁর সাথে থাকা তোরাবোরার ভাইদের মধ্যে শতকরা দশ থেকে বারো জন শাহাদাত বরণ করেছিলেন। তাদের অধিকাংশই সেখান থেকে সরে আসার সময় শহীদ হন। তোরাবোরা থেকে বের হওয়ার সময় একটি সংকীর্ণ উপত্যকায় তাঁরা অপেক্ষমাণ মার্কিন বিমানের বোমার শিকার হন। সেখানে প্রায় বিশ থেকে ত্রিশ জনের মতো শহীদ হন। আর তোরাবোরাতে আক্রমণের ফলে সেখানে প্রায় দশ জন মুজাহিদ শহীদ হন। উভয়টি মিলিয়ে আল্লাহর ইচ্ছায় সর্বমোট শহীদের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৩০-৪০ জনের মতো। আমরা আল্লাহর কাছে কামনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে তাঁদের সাথে জান্নাতুল ফিরদাউসের উঁচু মাকামে একত্রিত করেন।

এই ঘটনায় শতকরা দশ থেকে বারো জনের মতো মুজাহিদ শহীদ হওয়া অত্যন্ত বড় একটি বিষয়। এটি সাধারণ কোনো বিষয় নয়। যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে একজন হলেন, শহীদ আবু মিহজান রহিমাহুল্লাহ। তিনি আফগানে, বসনিয়ায় এবং তালেবানের শাসনামলে ইমারাতে ইসলামিয়ার পক্ষে জিহাদ করেন। অবশেষে তোরাবোরাতে শহীদ হন। আরেকজন হলেন, শহীদ মুহাম্মাদ মাহমুদ আল-মাক্কি

রহিমাহুল্লাহ। ইতিপূর্বে তিনি বসনিয়ায় জিহাদ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে আফগান জিহাদে শরীক হন এবং তোরাবোরাতে বোমা হামলার প্রথম পর্যায়ে শহীদ হন। আমি যখন তোরাবোরাতে উঠছিলাম, তখন তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। সে সময় তিনি একটি পয়েন্টের আমীর ছিলেন।

তোরাবোরায় ভাইয়েরা কেমন সময় অতিবাহিত করছিল এবং কতটা সংকীর্ণ অবস্থায় দিনাতিপাত করছিলেন, তা আপনাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরব। যখন তোরাবোরাতে উঠি, তখন সেখানকার কঠিন অবস্থার কথা আমাদের জানা ছিল না। এক ভাই অযু করার জন্য পানির কাছে আসলেন এবং খুব ভালোভাবে অযু সম্পন্ন করলেন। তখন শাইখ মুহাম্মাদ মাহমুদ আল-মাক্কি রহিমাহুল্লাহ তাকে বললেন, ‘ভাই, আপনাকে আল্লাহ হিদায়াত দিন। এখানে পানি স্বর্ণতুল্য।’ তাঁর এই কথা থেকে আমরা বুঝে গেছি যে, ভাইয়েরা সেখানে কীভাবে দিন কাটাচ্ছিলেন! সেই চিত্রটি তো স্বচক্ষেই দেখতে পেলাম। সেখানে পানির কদর স্বর্ণের চেয়েও বেশি ছিল। এটাই সেখানকার প্রকৃত অবস্থা।

ভাই তালুত রহিমাহুল্লাহ’র কথাও মনে পড়ছে আমার। এ ছাড়াও ভাই আবু ইয়াহইয়া আল-হাউন-এর কথাও মনে পড়ছে। তিনি একেবারে প্রথম দিকে তোরাবোরায় অংশগ্রহণ করেন। তারপর সেখান থেকে চলে যান। (আল-হাউন অর্থ মর্টার) শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল-হাউন রহিমাহুল্লাহ নাম অনুযায়ী মর্টারের ওপর বেশ অভিজ্ঞ ছিলেন।

যারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, ইমারাতে ইসলামিয়ার সাথে সম্পৃক্ত ছিল এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিল, তারা শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল-হাউনকে ভালো করেই চিনেন। তিনি খালদুনের বরকতময় মাদরাসার একজন অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন গুমনাম আল্লাহভীরু ব্যক্তি। তিনি সেই মহান

ব্যক্তিদের একজন ছিলেন, যারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য কাজ করে যান, কারো পুরস্কার বা প্রশংসার আশা করেন না। তারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কাজ করেন। তিনি শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ'র বন্ধু ছিলেন। আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ কৌতুক করে তাঁকে ইতালির শত্রু বলে ডাকতেন। কারণ তিনি একসময় ইতালিতে কাজ করতেন। তারপর ইতালি থেকে চলে আসেন এবং আফগানিস্তানে হিজরত করে জিহাদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দেন। তাঁর অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি সময়ের প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করতেন। আমরা তাকে দেখতাম, হয়তো তিনি জ্ঞান অর্জনে ব্যস্ত আছেন, অথবা কোনো আমলে মশগুল আছেন। তিনি আফগানিস্তানে খালদুন প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের একজন প্রশিক্ষক ছিলেন। একই সময়ে তিনি শাইখ আবু আব্দুল্লাহ আল-মুহাজিরের পরিচালিত দাওয়াহ ইনস্টিটিউটের একজন ছাত্রও ছিলেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে বিজয়ী বেশে নিরাপদে একত্রিত করুন, ইনশাআল্লাহ।

যখন বরকতময় হামলাগুলোর পর আফগানিস্তানে ক্রুসেড জোট হামলা শুরু করল, তখন শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল-হাউন রহিমাহুল্লাহ গোত্রীয় অঞ্চলে চলে গেলেন এবং সেখানে নতুন উদ্যমে মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ দিতে লাগলেন। যেহেতু তিনি মর্টার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাই সেখানে বিশেষভাবে তিনি মর্টারের প্রশিক্ষণ দিতে লাগলেন। শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল-হাউন রহিমাহুল্লাহ অত্যন্ত আল্লাহভীরু ছিলেন। তিনি সর্বদা এই আশঙ্কা করতেন যে, তাঁর কাছে কেউ মর্টার চালানোর প্রশিক্ষণ নিয়ে দুনিয়ার কাজে ব্যবহার করবে না তো! তিনি বিভিন্ন গোত্রের অবস্থা সম্পর্কে জানতেন। তাদের আত্মকলহ, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও হানাহানির কথা জানতেন। তাই প্রশিক্ষণ দানের আগে প্রত্যেকের কাছ থেকে কুরআনের ওপর হাত রেখে ওয়াদা নিতেন যে, তারা এই বিদ্যা একমাত্র জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজেই

ব্যবহার করবে। এ প্রশিক্ষণ কেবল মুসলিমদের চির শত্রু কাফেরদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। বিভিন্ন গোত্রের আনসার ভাইয়েরা শাইখের সাথে মজা করে কৃত্রিমভাবে তাঁর সামনে গুপ্তচর সাজার চেষ্টা করতেন। কিংবা তাঁর নথিপত্রের দিকে তাকানোর চেষ্টা করতেন। তো শাইখ রহিমাহুল্লাহ তাদের সামনে তখন নথিপত্রের খাতা বন্ধ করে দিতেন।

শাইখ রহিমাহুল্লাহ এভাবেই মৃত্যু পর্যন্ত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নীরবে-নিভৃতে কাজ করে গেছেন। তিনি জাইগোমেটিক হাড়ে ক্যান্সারের কারণে মারা যান। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন তাঁকে নেককার লোকদের মাঝে কবুল করে নেন।

তোরাবোরার শহীদদের মধ্যে আরেক ভাই হলেন, 'শাইখ হামযা আদ-দানদানি রহিমাহুল্লাহ।' তিনি হারামাইনের ভূমিতে সৌদি পরিবারের হাতে শহীদ হন। তখন জাযিরাতুল আরবে মুজহিদদের মাঝে এবং বিশ্বাসঘাতক সৌদি বাহিনীর মাঝে যুদ্ধ চলছিল। আর শহীদ শাইখ হামযা আদ-দানদানি রহিমাহুল্লাহ ছিলেন তোরাবোরাতে নতুন কিছু মুজাহিদ ভাইদের সমন্বয়ে গঠিত এক মাজমুআর আমীর। আর এ মাজমুআটি যুদ্ধের মধ্যে সুশৃঙ্খলতা ও নিয়মতান্ত্রিকতার দিক থেকে সবার চেয়ে এগিয়ে ছিল। (ভিডিও ধারণকারী জিম্মাদার ভাইদের উদ্দেশ্যে-) দুই মিনিট বাকি আছে? ঠিক আছে আমি সংক্ষিপ্ত করছি। দ্রুত শেষ করছি।

তোরাবোরা ছিল ইসলামি ঐক্যের অন্যতম নিদর্শন। যেখানে কেবল একটি দেশ থেকে মুজাহিদরা আসেননি বরং বহু দেশ থেকে মুজাহিদ ভাইয়েরা এসে একত্রিত হয়েছিলেন। জাযিরাতুল আরব, ইয়ামান (তাঁরা সর্বযুগেই ইসলামকে সহযোগিতা করেছেন), কুয়েত, বাহরাইন, পবিত্র হারামাইন এবং মাগরিব আল ইসলামি থেকেও মুজাহিদ ভাইয়েরা এসেছেন। আমি এখানে শাইখ আবু জাফর আল-জাযায়িরি

রহিমাহুল্লাহ’র কথা উল্লেখ করব এবং তাঁর সাথীদের কথাও উল্লেখ করব। যারা মরক্কো, তিউনিসিয়া, লিবিয়া, পাকিস্তান, আফগান, শাম এবং তুর্কিস্তান থেকে এসে যোগ দিয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই তোরাবোরাতে একত্রিত হয়েছেন। আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের সকলকে কবুল করে নেন, শহীদদের ওপর রহমত নাযিল করেন, বন্দিদেরকে মুক্ত করেন, আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করেন।

ইনশাআল্লাহ আগামী হালাকাতে কথা হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে ক্ষমা করুন।

# পর্ব ৭

এটি ইমামের সাথে অতিবাহিত দিনগুলো সিরিজের (أيام مع الإمام)-এর ৭ম পর্ব। এই পর্বে আমি ইমামুল জিহাদ, মুজাদ্দিদ, শহীদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ’র সাথে কাটানো কিছু মুহর্ত নিয়ে কথা বলব।

গত পর্বে তোরাবোরায় শাইখের সাথে আমার কিছু স্মৃতির কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। বন্ধু এবং শত্রুদের নিয়ে কথা বলেছি। তোরাবোরার সেসব শহীদদের নিয়েও আলোচনা করেছি, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা কবুল করেছেন।

এর আগের পর্বে আমার একটি ভুল হয়েছিল। তা হলো, শহীদ আলি মাহমুদ রহিমাহুল্লাহ’র নাম আমি ভুল করে শহীদ মুহাম্মাদ মাহমুদ বলে ফেলেছিলাম। তিনি তোরাবোরাতে এই নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। আল্লাহ তাঁর ওপর এবং সমস্ত মুসলিমের ওপর রহম করুন।

আজ আমি এই আলোচনার কিছুটা পূর্ণতা দিতে চাই। বন্ধুদের নিয়ে আলোচনা শেষে এবার সেসব শত্রুদের নিয়ে আলোচনা করব, যারা তোরাবোরায় আমাদের

প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছিল। উদাহরণস্বরূপ তাদের কয়েকজনকে উল্লেখ করব। সেসব বিশ্বাসঘাতকের মধ্যে অন্যতম হলো, হযরত আলী নামক এক ব্যক্তি। এই লোকটি ছিল শাইখ মুহাম্মাদ ইউনুস খালিস রহিমাহুল্লাহ'র হিযবে ইসলামি দলের একজন সদস্য। কিন্তু আফগানিস্তানে মুজাহিদদের মাঝে পারস্পরিক যুদ্ধের ফিতনা ছড়িয়ে পড়ার পর যখন তালেবানের বরকতময় অগ্রযাত্রা আরম্ভ হলো এবং তারা আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকার শুরু করল, তখন সে তালেবান-বিরোধী উত্তরাঞ্চলীয় জোট মাসউদ গ্রুপের সাথে গিয়ে মিলিত হলো। এর আগেও বলেছি, আমেরিকার সাথে এ গ্রুপের যোগাযোগ ছিল এবং তাদের নেতা আহমাদ শাহ মাসউদ মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের সাথে আঁতাত করেছিল। এ কথা আমরা ৯/১১ হামলা সম্পর্কে আমেরিকার কংগ্রেস প্রশাসনের উদ্ধৃতি থেকেই 'আস-সাহাব' মিডিয়ায় উল্লেখ করেছি। সেখানে আমরা এটাও বলেছিলাম, শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ এবং তাঁর সাথীদের হত্যার ষড়যন্ত্রে আমেরিকার সাথে সেও জড়িত ছিল। যাই হোক, এই নিকৃষ্ট দলটির সাথে যোগ দিয়েছিল সেই হযরত আলী।

আফগানিস্তানে ইমারতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধ শুরু হলো। এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই আহমাদ শাহ মাসউদ নিহত হয়। সে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে গিয়ে ইউরোপিয়ানদের সাথে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, সে আফগানিস্তানে ইসলামি মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে এবং আল-কায়েদা ও উসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। কেননা, এর দ্বারা আমেরিকার কাছে তার একটা অবস্থান তৈরি হবে এবং আমেরিকারও স্বার্থ রক্ষা হবে। আমরা এ বিষয়টা আস-সাহাব মিডিয়া কর্তৃক পরিবেশিত (قراءة للأحداث) 'ঘটনাপরিক্রম' এবং (حقائق الجهاد وأباطيل النفاق)-'জিহাদের বাস্তবতা ও নিফাকির অসারতা' নামে দুটি অডিওতে উল্লেখ করেছি।

আমেরিকার সৈন্যরা যখন আফগানিস্তানে প্রবেশ করে, তখন হযরত আলীও তাদের সাথে জালালাবাদ প্রবেশ করে। তাকে জালালাবাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। তোরাবোরায় মুজাহিদদের বিরুদ্ধে আমেরিকার হামলা শুরু হলে সে মুজাহিদদের অবরোধকারী একটি গ্রুপের লিড দেয়ার দায়িত্ব নেয়। সে অবরোধকারী দলের কমান্ডারদেরকে উৎসাহ দিত। তারা যেন কোনোভাবেই মুজাহিদদেরকে বিন্দুমাত্র সাহায্য না করে। সে তার সহকর্মী এক কমান্ডারকে সতর্ক করে এবং ভয় দেখিয়ে বলছিল, 'একজন আরবও যদি তোমার পাশ দিয়ে জীবিত বের হয়ে যায়, তাহলে তোমাকে হত্যা করব।' উত্তরে কমান্ডার বলল, 'আমার পাশ দিয়ে কোনো আরব যেতে পারবে না। বরং তুমি দেখো, তারা কার পাশ দিয়ে যায়?' এই পুরো ঘটনাটি আমাদের এক ভাই সরাসরি দেখছিল এবং তাদের কথোপকথন শুনছিল। আমি আগেও বলেছি যে, আমাদের ব্যাপারে অবরোধকারীদের পরস্পরের মধ্যে অনেক বেশি সংশয় ছিল। আমাদের বিরুদ্ধে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এমনই সন্দেহজনক ছিল। তাদের সম্পর্ক স্বার্থ আর নিফাকির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাদের কেউই কাউকে সম্মান করত না। আল্লাহর রহমতে তাদের মনে পরস্পরের জন্য মারাত্মক সন্দেহ ছিল। সুবহানাল্লাহ!

আরেক বিশ্বাসঘাতকের নাম হলো 'মুহাম্মদ যামান'। শাইখ নিজেই তার সম্পর্কে আমাদের বলেছিলেন। শাইখ যখন জালালাবাদে ছিলেন, তখন মুহাম্মাদ যামান তাঁকে ও তাঁর সাথীদেরকে হত্যার চেষ্টা করেছিল। তারপর যখন ক্রুসেডাররা তোরাবোরাতে মুজাহিদদের ওপর অবরোধ করে, তখন সে অবরোধকারী একটি গ্রুপের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। আমেরিকার গোলামির ব্যাপারে তার মাঝে আর হযরত আলীর মাঝে কঠিন প্রতিযোগিতা চলত।

একবার মুহাম্মাদ যামান শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ-কে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করেছিল। সে শাইখের কাছে চিঠি দিয়ে একজন দূত পাঠায়। আমিও সে চিঠি সম্পর্কে জানতে পেরেছি। অতঃপর যে সকল ভাই পাহাড়ের বিভিন্ন স্থানে পাহারা দিচ্ছিলেন, তারা দূতকে আটকে দেয় এবং জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কী চাও?' সে বলল, 'এটা মুহাম্মাদ যামানের পক্ষ থেকে শাইখের কাছে প্রেরিত একটি পত্র।' ভাইয়েরা বলল, 'আমরা জানি না উসামা বিন লাদেন এখানে আছে কি নেই। কিন্তু তুমি চিঠিটা আমাদের কাছে দিয়ে যাও।'

যাই হোক, অবশেষে চিঠিটি শাইখের কাছে পৌঁছল। দুই পৃষ্ঠার চিঠিতে যা লেখা ছিল, তার সারমর্ম ছিল এমন, 'শাইখ উসামা, আপনি হলেন ইসলামের আমানত এবং গৌরব।' এভাবেই প্রশংসা করে করে সে চিঠিটি লিখেছিল : 'আপনার সুরক্ষা উম্মতে মুসলিমাহর জন্য কল্যাণকর। আমি দৃঢ়ভাবে শপথ করে বলছি যে, আমি আপনাকে নিরাপত্তা দেবো। আপনার সেবা করে যাব। আসুন, আমার সাথে। আমার গাড়িতে করে আপনাকে নিয়ে যাব। আপনি আমার বাড়িতে আমার পরিবার-পরিজনের সাথেই থাকবেন। আমার পরিবারের একজন সদস্য হয়ে যাবেন। যেমনিভাবে আমি আমার পরিবারের জন্য প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করি, তেমনিভাবে আপনার জন্যও সেরূপ জানপ্রাণ দিয়ে সুরক্ষা নিশ্চিত করব। আপনি নিজেকে বিপদের মধ্যে রাখবেন না। আমি আশঙ্কা করছি, আমেরিকানরা আপনাকে হত্যা করে ফেলবে।' এমন আরো বহু কথা সেই পত্রে লেখা ছিল।

শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ ছিলেন যুদ্ধের ময়দান সম্পর্কে পরিপূর্ণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব। যে ভাই পত্রবাহক ও আমাদের মাঝে বার্তা বিনিময় করছিলেন, শাইখ তাকে বললেন, 'পত্রবাহককে বলে দাও, উসামা বিন লাদেন এখানে নেই। তিনি কোথায় আছেন আমাদের কারো জানা নেই!' এ

কথা শুনে বার্তাবাহক মুহাম্মাদ যামানের কাছে ফিরে গেল এবং আমাদের বার্তা শোনাল। কিন্তু মুহাম্মাদ যামান তাকে এই সন্দেহে বন্দি করল যে, সে তাকে মিথ্যা বলছে। আসল কথা হচ্ছে তাদের মাঝে সম্পর্কটাই ছিল এমন সন্দেহ আর সংশয়ে ভরা।

পরবর্তী সময়ে মুহাম্মাদ যামান পেশাওয়ারে মারা যায়। আমেরিকানরা তাকে সন্দেহ করে। সম্ভবত, হযরত আলী তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল। আমেরিকানরা তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ পায়নি। কিন্তু তাকে বিশ্বাসও করতে পারেনি। তাই তাকে তাড়িয়ে পেশওয়ারে পাঠিয়ে দেয়। শুনেছি সেখানেই সে নিহত হয়। আল্লাহই তার অবস্থা সম্পর্কে ভালো জানেন।

বিশ্বাসঘাতকদের মধ্যে তৃতীয় আরেক খবিস হলো 'হাজি দীন মুহাম্মাদ'। সে জালালাবাদের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিল। এই লোকটি শাইখ ইউনুস খালিস রহিমাহুল্লাহ'র সংগঠনের একজন সাহায্যকারী ছিল। যখন শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ জালালাবাদ আসেন এবং ইউনুস খালিস রহিমাহুল্লাহ'র আতিথ্য গ্রহণ করেন, তখন হাজি দীন মুহাম্মাদ নিজেকে উসামা রহিমাহুল্লাহ'র শুভাকাঙ্ক্ষী ও সাহায্যকারী বলে প্রকাশ করার চেষ্টা করত। এরপর যখন ক্রুসেডাররা আফগানিস্তানে হামলা শুরু করে, তখন এই ব্যক্তি আমাদের সাহায্যকারী আনসার ভাইদেরকে চাপ প্রয়োগ করত। যেন তারা আমাদের সাহায্য করা ত্যাগ করে। তাদেরকে বলত, 'তোরাবোরায় এখন যারা আছে, তাদের উচিত হচ্ছে জাতিসংঘের কাছে আত্মসমর্পণ করা। জাতিসংঘ প্রত্যেককে আপন আপন দেশে পাঠিয়ে দেবে।' আলহামদুলিল্লাহ। মহান আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে আমরা আত্মসমর্পণ করিনি।

তার সাথে শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ'র একটা পূর্বপরিচয় ছিল। পরিচয়টা তেমন শক্তিশালী ছিল না বরং স্বাভাবিক পর্যায়ের ছিল। এই সামান্য পরিচয়ের সূত্র ধরে

শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ তাকে উপদেশ দিয়ে একটি পত্র পাঠালেন। কারণ, তাকে জালালাবাদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যক্তি হিসেবে অভিহিত করা হতো। যখন জালালাবাদ থেকে তালেবান চলে যায়, তখন তার ভাই সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত হয়। ইনশাআল্লাহ এই বিষয়ে আমরা পরবর্তী সময়ে আলোচনা করব।

তো শাইখ উসামা তাকে এই মর্মে পত্র পাঠান যে, 'হাজি দীন মুহাম্মাদ, আমরা দুজনই বয়সের ভারে বুড়ো প্রায়। দুজনের চুলেই পাকন ধরেছে। জানি না কখন কাকে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিতে হয়। খুব সম্ভব আগামী দিন আমাদের যেকোনো একজন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবো। হয়তো আমি, না হয় তুমি। তোমার অবস্থা হলো, তুমি আমাদের বিরুদ্ধে আমেরিকাকে সাহায্য করছ। অতঃপর এই পাপের বোঝা নিয়েই তোমাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। আমাদের ও তোমাদের মাঝে তো কোনো সমস্যা নেই। তোমার নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, মন্ত্রিত্ব, রাজত্ব ইত্যাদি নিয়ে আমরা কোনো ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি না। তোমার কাছে আমরা এসব চাইও না। জিহাদের শুরু থেকেই তো আমরা তোমাদের ভাই হিসেবে আছি। আমরা মুসলিম, দ্বীনের জন্য স্বদেশ ছেড়ে এখানে এসেছি। আমরা মুসাফির, রোযাদার। আমাদের মাঝে তো কোনো বিরোধ নেই। সমস্যা হচ্ছে আমাদের আর আমেরিকার মাঝে। অতএব আমাদের এবং আমেরিকার মাঝ থেকে তোমরা সরে যাও। আমাদের বিরুদ্ধে আমেরিকাকে সাহায্য করো না।'

সে এই চিঠির কোনো গুরুত্বই দিল না বরং অবজ্ঞা করল। এমনকি আমরা এমনও শুনেছি যে, সে বলেছে, 'উসামা বিন লাদেন আমার কাছে চিঠি পাঠিয়ে বলছে, আমরা দুজনই বৃদ্ধ হয়ে গেছি। আমরা তোমাদের ভাই। উসামা আমার কাছে কী চায়? তালেবান চলে গেছে, আমেরিকা আমাকে ক্ষমতা দিয়েছে। আমি কি তার কথা

অনুযায়ী শাসন-ক্ষমতা ছেড়ে দেবো?' এভাবেই সে অতীতের জিহাদি জীবনকে কলঙ্কিত করল।

হাজি দীন মুহাম্মাদের দুজন সহোদর ভাই ছিল। একজন আব্দুল হক, অপরজন আবদুল কাদির। আব্দুল হক আমেরিকার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিল। আমেরিকা কারজাইর চেয়ে তাকেই বেশি ভরসা করত। এই যুদ্ধের শুরুর দিকে সে আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। তার সাথে বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ ছিল। তার কাছে একটি স্যাটেলাইট ডিভাইসও ছিল। তার সম্পর্কে কলিন পল বলে, 'আফগানিস্তানে আমাদের লোক থাকলে অমুক আছে। আমরা তার কাছে ভালো কিছুর আশা করি।' আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে যুদ্ধের শুরুর দিকেই তালেবান তাকে সম্পদসহ গ্রেফতার করে দেউলিয়া করে দিয়েছে।

তার দ্বিতীয় ভাই আব্দুল কাদির। তালেবান আন্দোলনের আগে সে জালালাবাদের গভর্নর ছিল। যখন তালেবান জালালাবাদ ছেড়ে চলে যায়, সে পুনরায় জালালাবাদের গভর্নর পদ দখল করে। তারপর কারজাই সরকারের মন্ত্রীর পদে সমাসীন হয়। আহমাদ শাহ মাসউদের পরিচালিত উত্তরাঞ্চলীয় জোটের একজন সদস্যও ছিল সে। কিন্তু তার মাঝে ও শাহ মাসউদের মাঝে কঠিন শত্রুতা চলছিল। যেহেতু তারা দুনিয়াপূজারি, তাই শত্রুতা থাকাটা স্বাভাবিক। কাবুলে একটি গুপ্তহত্যায় সে নিহত হয়। অনেকেই এমন মনে করেন যে, উত্তরাঞ্চলীয় জোটই তাকে হত্যা করে। প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই অধিক অবগত। আমেরিকার সহযোগী এই পরিবারের এমনই করুণ পরিণতি হয়েছিল।

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এসব ফিতনা ও মন্দ পরিণতি থেকে হেফাজত করেছেন। জীবনের এমন মন্দ সমাপ্তি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

ইতিপূর্বে আমি এমন কিছু অবরোধকারীর কথা আলোচনা করেছি, যারা আমাদের সাথে মাঝামাঝি অবস্থানে ছিল। এক ব্যক্তি আমাদেরকে অবরোধেও অংশ নিয়েছিল আবার তালেবানেরও দায়িত্বশীল ছিল। এমনকি তালেবান চলে যাওয়ার পরেও সে একটি অঞ্চলের দায়িত্বে ছিল। অবরোধের সময় সে আমাদেরকে এই বলে আশ্বাস দিয়েছে যে, আপনারা নিশ্চিত থাকুন। আমার পক্ষ থেকে আপনাদের কোনো ক্ষতি হবে না।

মজার বিষয় হলো, তোরাবোরা অবরোধকারীদের মাঝে আমাদের এক আনসার ভাইয়ের কয়েকজন বন্ধু ছিল। তারা ট্যাঙ্ক ফোর্সে ছিল। তিনি ওয়ারলেসের মাধ্যমে তাদের সাথে যোগাযোগ করতেন। একজনকে লক্ষ্য করে বলছিলেন, ‘হে অমুক, কেমন আছ তুমি? সাবধান! আমাদের কোনো আক্রমণ করবে না। অন্যথায় আমরা তোমাদের এন্টি ট্যাঙ্ক দিয়ে আঘাত করব। তোমাদের হত্যা করব।’ এভাবে তারা বলত আর হাসত। বিষয়গুলো এমনই মিশ্রিত ছিল।

হাজি দীন মুহাম্মাদ সম্পর্কে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। যেসব আনসার ভাই আমাদেরকে সাহায্য করতেন, সে তাদেরকে চাপ প্রয়োগ করত। এমন একজন আনসার ভাই ছিলেন। যিনি আমাদেরকে নিজের সর্বোচ্চ দিয়ে সাহায্য করতেন। তার সাথে হাজি দীন মুহাম্মাদের পরিচয় ছিল। তো দীন মুহাম্মাদ একদিন তাকে বলল, ‘এসব আরবদেরকে আর সাহায্য করো না। অন্যথায় আমেরিকা তোমার গ্রামের ওপর ৫০টি বিমান পাঠিয়ে পুরো গ্রামকে ধ্বংস করে দেবে।’ আনসার ভাই উত্তরে তাকে বললেন, ‘আমি কীভাবে আরবদেরকে পরিত্যাগ করব?! তাঁরা তো আমাদের জিহাদি ভাই। তাঁরা মুসাফির, গুরাবা, রোযাদার। কেবল আল্লাহর জন্য পরিবার-পরিজন ও দেশ ছেড়ে এসেছে। তাহলে আমি তাঁদেরকে কীভাবে পরিত্যাগ করব?!’ পরবর্তী সময়ে সত্যিকারার্থেই আমেরিকা তার গ্রামে

বিমান হামলা করে সেই গ্রামের ৫০ জন নাগরিককে শহীদ করে এবং তার পরিবারের ১৮ জনকে শহীদ করে। ঘটনাটি এর আগেও হয়তো বলেছি।

আরেকটি হাস্যকর ঘটনা, তবে অবরোধকারীদের পারস্পরিক সন্দেহের দুঃখজনক ঘটনা। একরাতে পাহাড়ের চূড়ায় আমরা কিছু মুনাফিককে দেখতে পাই। ঠিক আমাদের বিপরীত পাশে পাহাড়ের চূড়ায়। সেখানে একটি কক্ষও ছিল। মাগরিবের সালাতের পূর্ব-মুহূর্তে সেখানে তারা আগুন জ্বালিয়েছে। এই অবস্থা দেখে ভাইয়েরা বলাবলি করতে শুরু করে যে, 'তাদেরকে কীভাবে ছেড়ে দিই! নাহ, তাদেরকে এভাবে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। প্রথম দিন থেকেই যদি তাদেরকে ছাড় দিই, তাহলে তারা এখানে আসতেই থাকবে। বরং তাদের ওপর গুলি নিক্ষেপ করা উচিত। যাতে তারা এখান থেকে নেমে যায়।' তখন একজন আফগানি আনসারি ভাই বললেন, 'তাদেরকে হত্যা করো না। আমি তাদের নেতার সাথে কথা বলছি।'

তাদের মাঝে আশ্চর্য ধরনের এক সম্পর্ক ছিল! অতঃপর তিনি তার সাথে যোগাযোগ করে বলেন, 'এটা কীভাবে হলো? তোমার কিছু সাথী আমাদের বরাবর সামনের পাহাড়ে অবস্থান করছে। প্রত্যুত্তরে মুনাফিক সরদার বলল, 'আচ্ছা! ইনশাআল্লাহ আমি তাদেরকে সকালবেলায় সেখান থেকে নিয়ে আসব। এরা মূলত অন্য প্লাটুনের সাথে এসেছে। তারা আমাদের সাথে সম্পৃক্ত না। এই অঞ্চলের বাসিন্দাও না। এ জন্যই তারা সেই টিলার ওপর অবস্থান নিয়েছে। এরা জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বলছিল যে, এটা আমাদের ভূমি। অথচ তারা আমাদের স্বজাতির লোক নয়। তারা বলে আমরা এই টিলাটি দখলে নেবো। যাই হোক, আমি সকালে তাদেরকে নিয়ে আসব। তোমরা ভয় পেয়ো না। চিন্তা করো না।' এই অবস্থা দেখে ভাইয়েরা আশ্চর্য হয়ে গেল।

রাতের বেলায় তারা পাহাড়ের চূড়ায় আগুন জ্বালাল। এটি একটি চিন্তার বিষয়ও ছিল। কারণ আমরা ভাবছিলাম, এটা হয়তো তাদের আর আমেরিকানদের মধ্যকার কোন সংকেত হবে। রাতের বেলায় ঠিকই আমেরিকার বিমান আসলো এবং তাদের ওপর এমনভাবে বোমা হামলা শুরু করল যে, ভয়ে তারা পাহাড় ছেড়ে পালিয়ে গেল। এই অবস্থা দেখে আমরা বললাম, 'আলহামদুলিল্লাহ। যুদ্ধে মুমিনের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।'

এক সাথী ভাই যখন বলেছিলেন, 'আমরা অবশ্যই তাদের ওপর হামলা করব', তখন আরেকজন আনসার ভাই বলেছিলেন, 'নাহ, ওদেরকে মেরো না। ওরাও তো আমাদের ভাই।' তাঁর এ কথা শুনে সবাই হতভম্ব হয়ে গেল এবং হাসতে লাগল। আমি সাথীদের সাথে কৌতুক করতে করতে বললাম, 'ইনশাআল্লাহ, এ সংকট কেটে গেলে আমি আকিদা বিষয়ে একটি বই লিখব। সেখানে (الرد على من قال: أصحابنا) 'যে বলবে 'আমাদের ভাই' তার জবাব' নামে একটি পরিচ্ছেদ রাখব।

তোরাবোরায় যারা আমাদেরকে অবরোধ করে রেখেছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এ কথা বলে যুদ্ধ থেকে সরে পড়েছিল যে, 'আরবরা তো আমাদের কোনো ক্ষতি করতে চায় না। আমাদেরকে বোমা মেরে হত্যাও করতে চায় না।' এমন কথা বলে তাদের মধ্যে অনেকেই যুদ্ধ এড়িয়ে গেছে। এটা ছিল অবরোধকালে তাদের অবস্থা। আল্লাহর অনুগ্রহে তাদের এই দোদুল্যমান অবস্থা আমাদের উপকারে এসেছে।

আগেও বলেছি যে, শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ'র যুদ্ধবিদ্যার অভিজ্ঞতা আপনাদের সামনে তুলে ধরব। তো কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ করলেই শাইখের অভিজ্ঞতা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

প্রথমত, শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ যোগাযোগের বিষয়টিকে অত্যাধিক গুরুত্ব দিতেন। এ জন্যই আফগানিস্তানে সকল মুজাহিদ ভাইয়ের যোগাযোগের

ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার বিষয়টিকে তিনি সর্বদা পর্যবেক্ষণ করতেন। যাতে পুরো ময়দানের সবার খবর তাঁর জানা থাকে।

আমার মনে আছে, একসময় আমরা শাহিকোটের ভাইদের খবরাখবর সংগ্রহ করতাম। যেখানে পরবর্তী সময়ে প্রসিদ্ধ একটি যুদ্ধ হয়েছিল। আমরা মাজার-ই-শরীফের ভাইদের খবর নিতাম। পরবর্তী সময়ে যেখানে তাদের সাথে গাঙ্গীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। আমরা খোস্তের ভাইদের সংবাদ সংগ্রহ করতাম। শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ এসব অঞ্চলের সব ধরনের খোঁজখবর রাখতেন। কখনো যদি তাদের সাথে কোনো রূপ যোগাযোগ নাও করতে পারতেন, তবুও আফগানিস্তানের সব ময়দানের খবরাখবর তিনি সংগ্রহ করতেন। শুধু তাই নয়, তিনি শত্রুদের যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপরও নজরদারি করতেন। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে শাইখের এই নজরদারি মুজাহিদদের জন্য অনেক উপকারে এসেছে। গ্রুপ-লিডারদের মধ্য হতে এক ভাই আমাদেরকে এই বলে সর্তক করেন যে, আমাদের ওপর পেছন থেকে শত্রুদের হামলা আসতে পারে।

সেখানে রিবয়ি’ আল-ইয়ামানি নামক গুরুত্বপূর্ণ এক ভাই ছিলেন। তিনি কাহতান নামক একটি চূড়ার ওপর অবস্থান করছিলেন। ভাইয়েরা তাকে অনুরোধ করেছিলেন, যেন তিনি ইবনুশ শাইখ আল-লিবি রহিমাহুল্লাহ’র অবস্থানরত পাহাড়ের পেছন দিকটাতে একটু চেক করে দেখেন। কারণ এই পাহাড়টিতেই শাইখ ইবনুশ শাইখ আল-লিবি রহিমাহুল্লাহ ছিলেন। ভাই রিবয়ি’ আল-ইয়ামানি ছিলেন পাহাড়ের চূড়াতে, আর শাইখ ইবনুশ শাইখ আল-লিবি রহিমাহুল্লাহ ছিলেন পাহাড়ের পাদদেশে। তিনি যখন পাহাড়ের পেছনে গেলেন, তখন সেখানে একদল মুনাফিককে দেখতে পেলেন। তারা ইবনুশ শাইখ আল-লিবি ও তাঁর সাথীদের পেছন থেকে অনুপ্রবেশ করতে চাইছিল। এই অবস্থা দেখে তিনি মুনাফিকদেরকে আক্রমণ করার

জন্য সেখানকার কিছু ভাইয়ের কাছে সাহায্য চাইলেন। অতঃপর তারা সকলে মিলে মুনাফিকদের ওপর গ্রেনেড ছুড়ে মারেন এবং পেছন থেকে হামলা করেন।

এ আক্রমণটি ছিল সেসব জবাবি হামলার সূচনা, যেসব হামলার কারণে তোরাবোরার অবরোধ থেকে বের হওয়ার পথ খুলে গিয়েছিল। আর এটি ছিল শাইখ রহিমাহুল্লাহ'র বিচক্ষণতার অপর আরেকটি দিক।

আমেরিকানরা আরব মুজাহিদদের ব্যাপারে অপপ্রচার চালিয়ে বলল, 'আরবরা আমাদের সাথে আলোচনা করতে চাচ্ছে, তারা অবরোধ থেকে বের হতে অনুগ্রহের আবেদন করছে। তাদের এই প্রত্যেকটি কথাই ছিল বানোয়াট এবং ডাহা মিথ্যা। বরং মুনাফিকরা যখন মুজাহিদদের গুপ্ত হামলার শিকার হচ্ছিল, মূলত তারাই আমেরিকানদের সাথে শান্তি আলোচনা করতে চাচ্ছিল।

১৪২২ হিজরির ২৭ রমাদান মোতাবেক ২০০১ সালের ১২ ই ডিসেম্বর যুদ্ধবিরতি হলো। এর কারণ ছিল, মুনাফিকদের লাগাতার হামলাগুলো বিফলে যাচ্ছিল। তারা যখনই আমাদের ওপর হামলা করত, আহত আর নিহত হয়ে ফিরে যেত। অপরদিকে মুনাফিকদের বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি ও দুর্দশা দেখে আমেরিকান বাহিনীও তোরাবোরার ওপর থেকে আক্রমণের শিকার হওয়ার আশঙ্কায় হীনবল হয়ে গিয়েছিল। আর এত পরিমাণে তাদের বিমান হামলাও মুজাহিদদেরকে স্থানচ্যুত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ফলে তারা তাদের চিরাচরিত কাপুরুষাচিত কৌশল ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নিল।

কুন্দুজ, মাজার-ই-শরীফ ও গাঙ্গীর রণক্ষেত্রে তারা ঠিক একই পন্থাই অবলম্বন করেছিল।

প্রায় দুপুর একটার দিকে যুদ্ধবিরতি হলো। কারণ মুনাফিকদের পাহাড়ে ওঠার সব চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। মুজাহিদরা তাদেরকে গ্রেনেড হামলার মাধ্যমে প্রতিরোধ

করে যাচ্ছিল। সেখানে প্রায় ১০০ জন মুনাফিকের আরো একটি দল ছিল। যারা তোরাবোরার উপত্যকায় প্রবেশের চেষ্টা করছিল। যাতে তারা মুজাহিদদের মোকাবেলায় এগিয়ে আসতে পারে। কিন্তু তারা মুজাহিদদের ফাঁদে পড়ে যায়। তখন নিরুপায় হয়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করল এবং কথার ধরন পরিবর্তন করে বলল, 'আমরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে চাই না। তোমরা তো আমাদেরই ভাই। আর কেনই-বা তোমাদের সাথে যুদ্ধ হবে, আমরা কেন এর সমাধান করছি না? আমরা তোমাদের সাথে আলোচনা করে যুদ্ধবিরতি করতে চাই।'

তাদের কথা শেষ হওয়ার পর শাইখ রহিমাহুল্লাহ-ও যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবটি কবুল করেন। এই ১০০ জন মুনাফিক মুজাহিদদের বন্দুকের নলায় ছিল। মুজাহিদ ভাইয়েরা তাদের ওপর আক্রমণের অনুমতি চাইলেন। কিন্তু শাইখ অনুমতি দিলেন না। বরং নিষেধ করে বললেন, 'না, আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ বন্ধ করার ওয়াদা দিয়েছি। নিশ্চয় এটি শাইখের উন্নত চরিত্রের একটি দৃষ্টান্ত।'

মুনাফিকরা তাদের সৈন্য সরিয়ে নিতে সম্মতি জানাল এবং যুদ্ধবিরতি করে আলোচনায় বসতে একমত হলো। মুনাফিকরা সৈন্য প্রত্যাহার করার পর পরই আমাদের সাথে দেখা করতে চাইল। শাইখকে আল্লাহ তাআলা উত্তম প্রতিদান দান করুন। কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। বরং যোগাযোগ-প্রতিনিধিকে বললেন, 'তাদেরকে বলে দাও, আমাদের সাথে অনেক আরব মুজাহিদ আছেন এবং অনেক নেতৃবৃন্দও আছেন। সবার কাছ থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া এ মুহূর্তে সম্ভব নয়। আমাদেরকে আগে একত্রিত হয়ে পরামর্শ করতে হবে। তাই তোমাদের সাথে আগামীকাল সকালের আগে আলোচনায় বসতে পারছি না।' জবাবে তারা বলল, 'ঠিক আছে। আমরা আগামীকাল সকালে তোমাদের সাথে অমুক গ্রামের অমুক জায়গায় একত্রিত হবো এবং আমাদের মাঝে চলমান এই যুদ্ধের ইতি টানব।'

স্বভাবতই তারা আমাদের ভাইদের সাথে প্রতারণা করার ছক এঁকে রেখেছিল। আমি সামনে এ বিষয়ে আলোচনা করব। মুজাহিদরা সেই রাতেই তোরাবোরা থেকে বের হয়ে যায়। আমি এর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আলোচনা করব।

আচ্ছা, মুজাহিদগণ কেন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মেনে নিলেন? এর পেছনে অনেক কারণ ছিল। উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হলো, আমাদের রসদসামগ্রী প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ছিল এবং পাহাড় থেকে বরফ গলে পড়ার সম্ভাবনা খুব বেশি ছিল। হয়তো এক সপ্তাহ বা তার আগেই বরফ গলা শুরু হবে। সর্বদিক থেকে আমরা কঠিন অবরোধের মধ্যে ছিলাম। ঠান্ডায় পানিগুলো পর্যন্ত জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল। আমরা ছিলাম পাহাড়ের উঁচু টিলার ওপরে আর পানি ছিল আমাদের থেকে প্রায় ৫০০ মিটার নিচে। আমি শাইখের সাথে যেই টিলাতে ছিলাম, সেখানে আমাদের পাশেই একটি পানির ঝর্ণা ছিল। কিন্তু সেই পানির উপরিভাগ জমে গিয়েছিল। পানি আসত ঠিক, কিন্তু উপরিভাগ ছিল জমাটবাঁধা। তার ওপর দিন-রাত অনাবরত বোম্বিং হচ্ছিল ভাইদের ওপর। ওদিকে মুনাফিকরা জালালাবাদ ও কান্দাহারের পূর্ণ নেতৃত্ব দখল করে নিয়েছে। অবশেষে শাইখ তোরাবোরা খালি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, যাতে আমরা গেরিলা যুদ্ধের এক নতুন স্তর শুরু করতে পারি।

আর এই রাতেই, অর্থাৎ ২৭ রমাদানের রাতেই ভাইয়েরা তোরাবোরা থেকে বেরিয়ে যান। কিন্তু মুনাফিকগোষ্ঠী ব্যাপারটি বুঝতে পারে পরের দিন অর্থাৎ ২৮ রমাদান সকালে। তখন তারা অনুভব করল যে, এখানে কেউ নেই। কেউ তাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছে না। অবশেষে যেসব ভাইয়ের মাধ্যমে তাদের সাথে যোগাযোগ করা হতো, তাদের একজন যখন বলল, 'তোমরা কী চাও?' তখনই তারা নিশ্চিত হলো যে, মুজাহিদরা বের হয়ে গেছে অথবা মুজাহিদদের বড় একটি অংশ বের হয়ে

গেছে। অথচ আগের দিন তারা বলেছিল, ‘আমরা তোমাদের সাথে সমস্যার সমাধান করতে চাই।’ কিন্তু আজ আবার কথার সুর পরিবর্তন করে বলছে, ‘আমরা তোমাদের হত্যা করব!’ যখন তারা বুঝতে পারল যে, মুজাহিদরা তাদের ষড়যন্ত্রে পা দেয়নি, তখন তারা এভাবেই কথা বলতে থাকল।

এই ঘটনার পর আমেরিকা দাবি করল যে, আমরা তখন তোরাবোরায় ছিলাম। কিন্তু কীভাবে?! তারা তো ভয় আর হীনম্মন্যতার চূড়ান্ত পর্যায় অতিক্রম করছিল এবং তোরাবোরায় প্রবেশ করতেই ভয় পাচ্ছিল। বরং মুজাহিদরা সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর প্রথমে মুনাফিকরা প্রবেশ করেছে এবং মুনাফিকদের প্রবেশের দুদিন পর ভীতু আমেরিকা প্রবেশ করেছে।

এমনকি আমরা মুনাফিকদেরকে পরস্পর ওয়ারলেসে বলতে শুনেছি যে, ‘খচ্চরগুলো পাঠাও। মেহমানরা তো ক্লান্ত হয়ে গেছে। তাদের ওপর ঠান্ডা চেপে বসেছে।’ সে এর দ্বারা আমেরিকানদেরকে উদ্দেশ্য করছিল। এটা হচ্ছে আমেরিকার বিশেষ ফোর্স পাহাড় ও বিমান ডিবিশন ৮২-এর সৈনিকদের ঘটনা।

মুজাহিদরা যখন আল্লাহর পথে অটল থাকে, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে এবং মৃত্যু পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার সংকল্প করে, তখন আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাদেরকে বিজয় দান করেন ইনশাআল্লাহ।

আমরা যখন তোরাবোরা থেকে বের হয়ে যাই, তখন আমি মুহাম্মাদ যামানকে বিবিসিতে সাক্ষাৎকার দিতে শুনলাম। বিবিসির সাংবাদিক তাকে জিজ্ঞেস করছিল, ‘হাজি সাহেব! আরবরা কোথায়? আপনারা তো বললেন, এখানে ৫০০ জন আরব ছিল, ১০০০ জন আরব ছিল। কিন্তু কোথায় তারা?’ সে বলল, ‘আরবরা সবাই মারা গেছে।’ সাংবাদিক জিজ্ঞেস করল, ‘কীভাবে মারা গেছে?’ সে বলল, ‘হ্যাঁ। সেখানে প্রায় ২০০ জনের মরদেহ আছে।’ আমি তো শাইখের আগেই বের হয়ে এসেছিলাম।

তার এসব কথা শুনে আমি বললাম, ‘সুবহানাল্লাহ! ২০০ জন! কীভাবে?!’ এ কথা স্পষ্ট যে, তাদের দেয়া এসব তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং অপপ্রচার। এসব মিথ্যা প্রচারের উদ্দেশ্য হলো, আমেরিকার কাছ থেকে যেই পয়সা তারা নিয়েছিল, তার একটা বৈধতা দাঁড় করানো। আর আমেরিকাও তার জনগনের কাছে প্রমাণ করতে চাইল যে, তারা কিছু একটা করেছে।

এরা শাহিকোটেও এই একই ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়েছিল। তারা বলেছিল, ‘শাহিকোটে এত এত আরব রয়েছে। সেখানে ১০০০ আরব রয়েছে, ২০০০ আরব রয়েছে। ইত্যাদি ইত্যাদি...। আমরা অচিরেই সেখানে প্রবেশ করব। তাদের ওপর হামলা করব। আমরা এটা করব। ওটা করব।’ অবশেষে তারা বলল, ‘মার্কিন বাহিনী শাহিকোট থেকে সরে গিয়েছে এবং সেখানে বোম্বিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রিয় উম্মাহ, এসব ঘটনাপ্রবাহ থেকে জিহাদি মিডিয়ার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়।

ভাইয়েরা আমার, এ যুদ্ধে জিহাদি মিডিয়া আমেরিকার মিথ্যা মুখোশ খুলে দিয়েছে। এবং ক্রুসেড-জোট ন্যাটো ও তাদের সহযোগী মুনাফিকদের আসল চেহারা প্রকাশ করে দিয়েছে।

তারা সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে ইরাকের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ এবং ৯/১১ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি প্রতিটি ক্রুসেড যুদ্ধকে সিএনএন-এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করেছে। জিহাদি মিডিয়াগুলো তাদের এই স্বল্প সরঞ্জাম নিয়ে আরব মিডিয়ার মুখোশ খুলে দিয়েছে। পশ্চিমা মিডিয়ার পক্ষে যে চিত্র প্রকাশ করা কখনো সম্ভব হতো না, সে চিত্রকে জিহাদি মিডিয়াই প্রকাশ করে দিয়েছে।

আমি এখানে জিহাদি মিডিয়া নিয়ে সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই,

প্রিয় ভাইয়েরা, হে জিহাদি মিডিয়ার বীর সৈনিকেরা, তোমরাই তো আমেরিকাকে শঙ্কিত করতে, তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করতে, তোমরাই তো তাদেরকে

পরাজিত করে দিয়েছ মিডিয়া-যুদ্ধে। আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে মুজাহিদ ভাইয়েরা লন্ডন, মাদ্রিদ, বালির হামলা এবং ৯/১১-এর বরকতময় হামলার মাধ্যমে ময়দানের যুদ্ধকে কাফেরদের ভূমিতে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। এবং আমরাও বিভিন্ন প্রকাশনা, লেকচার, ভিডিও এবং জিহাদি পরিবেশনার মাধ্যমে তাদের ওপর মিডিয়াতেও জয়ী হয়েছি।

প্রিয় ভাইয়েরা, যে মার্কিন শত্রু এবং মার্কিন মিডিয়াকে আমরা এক সময় দিশেহারা এবং ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলাম, সেই মার্কিন মিডিয়াই আজ আমাদের মাঝে দ্বন্দ্ব বাধিয়ে আমাদের মিডিয়াকে প্রতিহত করেছে। জিহাদি মিডিয়া যেন এখন জিহাদের অবকাঠামো ধ্বংসের একটি যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। জিহাদি মিডিয়াগুলো আজ গালি, অপবাদ আর সমালোচনা দ্বারা ভরে গেছে। মুজাহিদদের নেতৃত্ব ও শাইখদের থেকে শুরু করে একজন সর্বনিম্ন স্তরের ভাইয়ের পর্যন্ত সমালোচনা করছে। এটা এখন যে কারো সমালোচনার উর্বর ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

আমি জিহাদি মিডিয়াকর্মী ভাইদের প্রতি সবিনয় নিবেদন করব, আপনারা প্রতিটি কথার গুরুত্ব ও জিম্মাদারি অনুধাবন করুন। প্রতিটি কথাই আমানত। মিডিয়া একটি অনেক বড় আমানত।

অতএব এমন কিছু প্রকাশ করবেন না, যা মুজাহিদদের কাতারগুলোকে বিভক্ত করে দেয়, তাদের মাঝে বিচ্ছিন্নতাকে উসকে দেয়। এমন কিছু পরিবেশন করবেন না, যা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে শত্রুদের সাহায্য করে এবং মুজাহিদদের মাঝে ফিতনা ছড়িয়ে দেয়।

আমরা আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর ও শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ'র অধীনে একই পতাকাতলে ছিলাম। আমরা কাঁধে কাঁধ রেখে যুদ্ধ করেছি। যার কারণে আমাদের ওপর রব্বুল আলামিনের রহমত নাযিল হতো।

এখন শুরু হলো বিভক্তি আর বিচ্যুতি। একেকজন একেক চিন্তাচেতনা লালন করছে, একেকজন একেকদিকে ছোটাছুটি করছে। আমাদের নিজেদের মাঝেই যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে! এসব কারণেই আমরা বিজয় অর্জন করতে পারছি না। আমাদের থেকে বরকত উঠিয়ে নেয়া হচ্ছে। আমি আমার মিডিয়া যোদ্ধাদের বলব, আপনারা কথা বলার দায়িত্ব সঠিকভাবে আদায় করুন। এক মাজমুআ সম্পর্কে আরেক মাজমুআর সমালোচনাকে কোনোভাবে মেনে নেবেন না। এরা কাফের, ওরা বিশ্বাসঘাতক, এরা মিলিশিয়া, ওরা হত্যাযোগ্য দল—এ ধরনের সব কথা বন্ধ করতে হবে। এ ধরনের কথায় যে অংশ নেবে, আল্লাহর সামনে সে-ই তার জবাবদিহি করবে।

আমি এবং আমার ভাইয়েরা ব্যক্তিগত যেকোনো বিষয়ে ক্ষমা করে দেবো। কিন্তু মুজাহিদদের ঐক্য বিনষ্ট করে এবং তাদের মাঝে ফাটল ধরায় এমন কোনো বিষয়কে আমরা ক্ষমা করব না।

আমার এ বার্তা যেন সবার কাছে পৌঁছে যায়।

আমরা পুনরায় শাইখের যুদ্ধ পরিচালনার অভিজ্ঞতার দিকে ফিরে যাই। শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ ২৭ রমাদানের এই রাতে সকল মুজাহিদ ভাইদেরকে তোরাবোরা থেকে বের করার জন্য বিন্যস্ত করছিলেন। আর শাইখকে তোরাবোরা থেকে যিনি বের করেছিলেন, তিনি হলেন মৌলভি নূর মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহ ও তাঁর সাথীগণ। আল্লাহ তাঁদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। সেই রাতে শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ শাইখ ইবনুশ শাইখ আল-লিবির কাছে গিয়েছিলেন। উভয়ে মুজাহিদদেরকে নিরাপত্তার সাথে বের করার জন্য পরিকল্পনা করছিলেন। মৌলভি নূর মুহাম্মাদ তাঁকে তাড়া দিয়ে বলছিলেন, 'সামনে আমাদের দীর্ঘ সফর। এখনই আমাদেরকে বের হতে হবে।' কিন্তু শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ নিজে বের হলেন রাত ১১টার দিকে। আর এটা তাঁর জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। শাইখের এটাই

চাওয়া ছিল যে, সকল সাথী নিরাপদে বের হয়ে যাক। তারপর আমি বের হবো। তিনি তা-ই করেছেন।

আজকের আলোচনা এই পর্যন্তই সমাপ্ত করলাম। ইনশাআল্লাহ আগামী পর্বে আরো আলোচনা হবে।

# পর্ব ৮

বেশ কয়েক বছর পর "আয়্যামুন মাআল ইমাম" (ইমামের সাথে কাটানো দিনগুলো) এর অষ্টম কিস্তি পুনরায় রেকর্ড করার ইচ্ছা করেছি। কারণ মহান আল্লাহ তায়ালার (প্রথম ও শেষ – সকল প্রশংসা একমাত্র তার জন্য) ইচ্ছায় এই পর্বের প্রথম রেকর্ডটি বোমা বর্ষণের ফলে পুড়ে যায়। সে কপিটি সম্মানিত ভাইদের একজনের নিকট ছিলো, যারা তাঁদের আল্লাহ'র রাস্তার মুজাহিদ ভাইদের সেবায় নিজেদের জান উৎসর্গ করেছেন। আমি মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করছি – আল্লাহ যেন এই ভাইকে একজন শহীদ হিসেবে কবুল করেন এবং আমাদেরকে, তার পরিবার-পরিজনকে ও সকল মুসলমানকে তার উত্তম স্থলাভিষিক্ত দান করেন, আমীন।

বিভিন্ন ব্যস্ততা ও অস্থিতিশীলতার কারণে শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ'র সাথে কাটানো আমার সুন্দর ও চমৎকার স্মৃতিচারণগুলো লেখার সুযোগ হয়ে উঠেনি।

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ কিন্তু সে নয়- আমার পালনকর্তা যার প্রতি অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু"। (সূরা ইউসূফ ১২:৫৩)

এখন আমার ইচ্ছা হলো, এই কিস্তিতে আমি "তোরাবোরা"র যুদ্ধ ও তা থেকে আমাদের শিক্ষা নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা করবো। আমি গত কিস্তিতে চুক্তির বিষয়ে আলোচনা সমাপ্ত করেছি, যেই চুক্তি মুনাফিকরা ভঙ্গ করেছিল। এর ফলে শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ তোরাবোরা পাহাড় থেকে ১৪২২ হিজরীর ২৭শে রমজান তথা ১২/১২/২০০১ খ্রিষ্টাব্দের দিবাগত রাতে মুজাহিদ ভাইদেরকে বের করে নিয়ে আসেন।

উভয় পক্ষ অর্থাৎ একদিকে আমেরিকা ও তাদের মুনাফিক দোসররা অন্যদিকে মুজাহিদগণ কি কারণে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছেন – তা নিয়ে আমি বিগত পর্বে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করেছি।

আমেরিকানদের অন্তরে হতাশা ছেয়ে যাবার পর তারা তোরাবোরা পাহাড়ে আক্রমন করার সাহস হারিয়ে ফেললো। এরপর গাদ্দারী ও কলাকৌশলের দ্বারা মুজাহিদদেরকে হত্যা করাই আমেরিকা ও তাদের মুনাফিক দোসরদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে উঠলো।

এখানে একটু যোগ করতে চাই যে, ১৪২২ হিজরীর ২৪ শে রমজানে শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ'র নিভর্রযোগ্য ও আস্থাভাজন একদল "আনসার" শাইখের কাছে এসে বলেছেন, শাইখ রহিমাহুল্লাহসহ তার অল্প কিছু মুজাহিদ ভাইদের আশ্রয় নেয়ার জন্য তারা একটি নিরাপদ জায়গার ব্যবস্থা করেছেন।

তখন শাইখ রহিমাহুল্লাহ আমার সাথে এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে বললেন, "আপনি আরো কিছু ভাইসহ আনসার দলটির সাথে তোরাবোরা পাহাড় থেকে আগে

বের হবেন। তারপর আপনি পাহাড় থেকে বের হওয়ার পথ সম্পর্কে বিবরণ মূলক একটি পত্র পাঠাবেন”। কিন্তু আমি বললাম; “না, না!! এটা কিভাবে সম্ভব? আপনি প্রথমে পাহাড় থেকে বের হন। আর এখানে আমি মুজাহিদ ভাইদের সাথে থেকে যাই”।

শেষ পর্যন্ত শাইখ রহিমাহুল্লাহ’র পীড়াপীড়ির কারণে আমাকেই তোরাবোরা পাহাড় থেকে বের হতে হল। আমি শাইখ রহিমাহুল্লাহ’কে পাহাড় থেকে বের হতে বারবার আবেদন করেছি। কিন্তু উল্টো তিনি আমাকে বারবার বের হতে বলেছেন। দৃশ্যটি ছিলো অত্যন্ত আবেগঘন ও হৃদয়বিদারক। কারন আমার জানা ছিলো না যে, শাইখের সাথে দ্বিতীয়বার আর কখনো দেখা হবে কিনা!

তাছাড়া এই কঠিন পরিস্থিতিতে শাইখ রহিমাহুল্লাহ সহ তার সাথীদের রেখে চলে যাওয়াটিও ছিলো বেশ কষ্টের ও যন্ত্রণার। কিন্তু এত কিছুর পরেও শাইখ রহিমাহুল্লাহ তাঁর সিদ্ধান্তে অনঢ় ছিলেন। আমার মনে আছে যে, আমি তখন শাইখ রহিমাহুল্লাহ’কে এই বলে বিদায় জানিয়েছি যে, আল্লাহ চাইলে আমাদের পুনরায় সাক্ষাৎ হবে।

আমি প্রথম স্টেশনে পৌঁছে শাইখ রহিমাহুল্লাহ’র নামে একটি চিঠি লিখেছি। যেই চিঠিতে বের হওয়ার পথ ও তার সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরে শাইখ রহিমাহুল্লাহ ও তার সঙ্গীদেরকে তোরাবোরা পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসতে উদ্ভুদ্ধ করেছি। এদিকে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার ভূমিকা স্বরূপ ২৭ শে রমজানে কার্যত যুদ্ধবিরতি শুরু হয়েছিল। তখন শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ সুযোগ বুঝে ২৭ শে রমজানের দিবাগত রাতে সঙ্গীদের তোরাবোরা পাহাড় থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যেতে বলেছিলেন।

আস্থাভাজন এক আনসার ভাই, শাইখ রহিমাহুল্লাহ’র জন্য আমার লেখা পত্রটি বহন করেছেন। আর আল্লাহর ইচ্ছায় তোরাবোরা পাহাড়ের নিকটস্থ একটি উপত্যকায়

রাত্রে শাইখের দলটির সাথে পত্রবাহী আনসার ভাইয়ের সাক্ষাত হয়। তখন আনসার পত্রবাহক শাইখের সাথে মিলিত হয়ে তাকে আমার পত্রটি প্রদান করেন। এই কঠিন পরিস্থিতিতে, এতো অন্ধকারের মাঝে এবং দ্রুত স্থান ত্যাগ করার প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও এই আনসার তার নামে এই মর্মে একটি প্রশংসাপত্র লিখে দেয়ার জন্য শাইখ রহিমাহুল্লাহ'কে পীড়াপীড়ি করলেন, যাতে উল্লেখ থাকবে যে, "এই আনসার জিহাদের ময়দানে শাইখ রহিমাহুল্লাহ'র সঙ্গী ছিলেন এবং যেসব মুসলিমের সাথে তার দেখা মিলবে তারা তার জন্য কল্যাণ কামনা করবে"।

আফগানদের কাছে এই প্রশংসাপত্রের মূল্য কী ধরণের তা শুধুমাত্র আফগানে যারা বসবাস করেছেন তারাই বুঝতে পারবেন। আফগানরা এই প্রশংসাপত্রকে বংশ পরম্পরায় গর্বের বিষয় মনে করেন। আরব মুজাহিদদের সহায়তা ও সহযোগিতা করাকে তারা অনেক উঁচু স্তরের ভাল কাজ বলে মনে করেন।

আফসোস! বস্তুবাদী চিন্তার এই ফেতনার যুগে অধিকাংশ লোকেরা এই বিষয়ের কদর ও মূল্যায়নের বিষয়টি – উপলব্ধি পর্যন্ত করতে পারে না। তারা কখনো কখনো আপত্তির ঝড় তুলে বলাবলি করে; এই কঠিন পরিস্থিতিতে এই আনসার কেন এই প্রশংসাপত্র লাভের জন্য পীড়াপীড়ি করছে। কিন্তু এই প্রশংসাপত্রের মূল্য তারা কীভাবে বুঝবে? এর প্রকৃত মূল্য আফগানদের কাছেই রয়েছে। আফগানদের কাছে এই প্রশংসাপত্রকে সীমাহীন উচ্চ মর্যাদার চাবিকাঠি বিবেচনা করা হয়।

আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে, পাহাড়ের নিকটস্থ অনেক গোত্রীয় নেতারা শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ থেকে কয়েকটি প্রশংসাপত্র লিখে দেয়ার আবেদন করেছিল। যাতে লেখা থাকবে: 'বিগত এই যুদ্ধগুলোতে তারা শাইখ রহিমাহুল্লাহ'র সাথে অংশগ্রহণ করে শাইখ রহিমাহুল্লাহ'কে সহযোগিতা ও সহায়তা করেছেন'।

যুগ যুগ ধরে এই প্রশংসাপত্র তাদের গর্বের কারণ হয় এবং এতে তারা নিজেদেরকে ধন্য মনে করে।

আফগানদের নিয়ে শাইখ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ'র একটি কবিতা রয়েছে। এই কবিতা শাইখ উসামা বারবার বলতেন। কবিতার পঙক্তিগুলো শাইখ ইউসূফ আবু হেলালের প্রশংসার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কবিতাটি নিম্নরুপ:

بـهـم يـتشـرفُ المـثـلُ مـضـيـثُ مجـاهداً مع من
إذا احـتـدمـت ولا عـزلُ بـني الأفـغـانِ لا مـيـلٌ
وفـوقَ جـحيمِها اكتهلوا علـى نـارِ الأسـى شبـوا
وعنهم ليسَ ينفصلُ وكان الحزنُ يلبسُهم
فـقِ المـوارِ تـغـتسلُ فتـلك ربـوعُهم بـالـدا
تِ بالـنـيرانِ تـشـتعلُ وتحـتَ صـواعـقِ الـغـارا
لِ تُسـحـقُ وهي تبتهلُ وتـلـك جـماجـمُ الأطـفا
وما بـهمُ احتفى الفشلُ فـمـا ذل الإبـاءُ بـهـم
ومـوجُ البـذلِ مـتـصـلُ ورأسُ الشـعـبِ مـرتـفـعٌ

অনুবাদ:

"যাদের মাধ্যমে ধন্য হলো উপমা

তাদের নিয়ে চললাম জিহাদের ময়দানে

তারা হলো আফগান সন্তান

তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বলিনি আমি তা,

রাগে জ্বলে উঠি যখন আমি,

কবু রাগ সংবরণ করি না তখন আমি।

শোকের আগুনে জ্বলে উঠে তারা,

শোকের তীব্র অগ্নিতে বেড়ে উঠে তারা।

তারা আছে বিষন্নতার চাদরে ঢাকা,

প্রস্থান করবে না এই ছায়া তাদের হতে।

তাদের অঞ্চল প্রচন্ড

বোমার আঘাতে হয় প্রকম্পিত।

হামলার বজ্রধ্বনিতে হয়

তাদের ঘরবাড়ি অগ্নি প্রজ্বলিত।

তাতে হচ্ছে শিশুদের মাথার খুলি গুঁড়ো গুঁড়ো,

আর যালেমদের দিয়ে যাচ্ছে তারা অভিশাপ।

কিন্তু বশ্যতা স্বীকার করেনি বাবারা,

তাই ছুঁতে পারেনি তাদেরকে কাপুরুষতা।

আফগান জাতী চির উন্নত শির,

চলমান থাকবে ধারা এই ত্যাগের।”

শাইখ ইউসুফ আবু হেলাল হাফিযাহুল্লাহ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ ও তোরাবোরা পাহাড়ের বীর নায়কদের প্রশংসা করে একটি কবিতা লেখেন-

أسامةُ والمفاخرُ ضابحاتٌ　　　توالت ليس يُحصيهن عدُ

تجودُ لِذكرِكم بالدمعِ عينٌ　　　ويَدمى يا حبيبَ الروحِ خدُ

لئن كثرت على الدنيا عِظَامٌ　　　فإنك في حماها اليومَ فردُ

تعودت اغتيالَ اليأسِ فينا　　　تسيرُ بنا لكلِ علاً وتغدو

أتيت تُطلُ من مُقلِ الضحايا　　　ودونَ الثأرِ لم يغلُلْك قيدُ

مَضاؤك في يدِ الأقدارِ سيفٌ　　　ونهجُك في يدِ الإسلامِ بندُ

رجالُك يومَ زمجرتِ الرزايا　　　عليها باقتحامِ الموتِ ردوا

وحشوُ نفوسِهم كبرٌ أشمٌ　　　وملءُ صدورِهم عزمٌ أشدُ

ورايات الجهادِ (بتورا بورا)　　　بها انتفضتْ قساورةٌ وأسدُ

لئن حلت بأمريكا الدواهي　　　ودكَّ بروجَها هدمٌ وهدُ

فكم أرضٍ وقد عاشت عقوداً　　　تروحُ على زلازلِها وتغدو

وتعلنُها على الإسلامِ حرباً　　　لها باسمِ الصليبِ قوىً وحشدُ

جهاداً يا أحبتَنا جهاداً　　　فما دونَ امتطاءِ الهولِ بدُ

অনুবাদ:

"উসামা সম্মুখপানে অগ্রসর হচ্ছে ঊর্ধ্বশ্বাসে এবং রণ হুংকারে,

তার রয়েছে অসংখ্য গৌরবময় ক্রমাগত কীর্তিধারা

তোমাদের স্মরণে আঁখি দিয়ে ঝরবে অশ্রু ঝরঝর,

হে প্রিয় আমাদের! রক্তাক্ত হচ্ছে তোমাদের গাল।

পৃথিবীতে যদিও বৃদ্ধি পেয়েছে মহান ব্যক্তির,

পৃথিবী রক্ষায় কিন্তু তুমি আজ এক অদ্বিতীয় মহান।

অভ্যস্ত তুমি আমাদের হতাশা দূর করতে,

চললে আমাদের নিয়ে উচ্চমর্যাদার জন্য সম্মুখ অভিমুখে।

আবির্ভূত হয়েছো তুমি আত্মোৎসর্গের তলদেশ থেকে,

কোন হাতকড়া বাঁধা দিতে পারেনি বদলা নিতে তোমাকে।

নিয়তির সামনে সংকল্প তোমার তরবারীতুল্য,

ইসলামের পথে বিজয়ের পতাকা তোমার আদর্শ।

দুর্যোগের গর্জনে তোমার লোকেরা,

মৃত্যুতে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিহত করে তা।

তাদের প্রাণ ভর্তি উচ্চগর্ব-অহংকার,

তাদের বক্ষ ভরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

(তোরাবোরা) জিহাদের ঝান্ডায়,

কেঁপে উঠেছে সিংহ-পশুরাজ।

আমেরিকায় নেমে এসেছে বিপদ আর দুর্যোগ,

ধ্বংস-বিনাশ করেছে আমেরিকার টাওয়ার।

কোন ভূমি অতিবাহিত করেছে কয়েক দশক,

যাতে নেমে এসেছে দিবারাত্র বিপদের উপর বিপদ।

এ যাবৎকাল দিয়ে আসছে আমেরিকা,

ইসলামের বিরুদ্ধে মজবুত ক্রুসেড যুদ্ধের ঘোষণা,

তাতে সংঘবদ্ধ হয়েছে সব কুফফার সেনা।

যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ো তাই হে প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা,

ভয়াবহ বিপদের উপর আরোহণ করে পরিত্রাণ পাবো আমরা।"

আর এটি হলো তোরাবোরা যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ঘটনা।

তোরাবোরা পাহাড়ের যুদ্ধ থেকে আমরা যে সকল গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পেয়েছি এখন আমি সেই বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। এই যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলো নিম্নরুপ:

প্রথম শিক্ষা

তোরাবোরা পাহাড়ে আমাদের প্রথম শিক্ষা হলো;

শত্রুর বিরুদ্ধে মুসলিমদেরকে বিজয় দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের উপর অনুগ্রহ করার সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ একটি কারণ হল – শক্তির ভারসাম্য ঠিক থাকা এবং বিষয়গুলোর আকীদাগত অবস্থান স্পষ্ট করা। মুসলিম জাতির বীরত্ব ও সাহসিকতা জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে এবং সহমর্মিতা লাভ ও সমবেদনা অর্জনের ক্ষেত্রে – আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোরাবোরা যুদ্ধকে একটি কারণ বানিয়ে সেখানে অংশগ্রহণকারী সকল মুজাহিদকে সম্মানিত করেছেন।

আমরা ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করেছি যে, যখন দখলদার রাশিয়া ও তাদের ভাড়াটে এজেন্টদের বিরুদ্ধে আফগান জিহাদ শুরু হলো; তখন পুরো মুসলিম জাতি মুজাহিদদের প্রতি সহানুভূতির হাত বাড়িয়েছে এবং সহমর্মিতা দেখিয়েছে। এক্ষেত্রে রাফেজিরাও আফগান মুজাহিদদের সহযোগিতা করেছে।

কিন্তু মুজাহিদরা যখন পরস্পর আত্মকলহে লিপ্ত হলো এবং মুজাহিদদের বন্দুকের নল নিজেদের ভাইদের দিকে ঘুরে গেলো, তখন মুসলিম উম্মাহ মুজাহিদদের থেকে

মুখ ফিরিয়ে নিলো। এর ফলে মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য মুজাহিদ ভাইগণ তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

উদাহরণত; যখন আফগান জিহাদি নেতারা রাশিয়া ও তাদের ভাড়াটে দোসরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন তখন এই সব মুজাহিদ মুসলিম উম্মাহর চোখে সাহসী নায়ক ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে যখন তাদের অনেকেই দখলদার আমেরিকাকে সাহায্য করলো তখন এই সব মুজাহিদদেরকেই আমেরিকার দোসর ও বিশ্বাসঘাতক ভাবতে শুরু করেছেন মুসলিম জাতি।

যখন মুজাহিদদের টার্গেট ও লক্ষ্য স্পষ্ট হবে এবং তাদের কাতার এক হবে তখন আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে নুসরত ও বিজয়ের নেয়ামত দান করবেন। তাই আমাদের প্রথম বার্তা হলো; দায়িত্বশীলগণ অহেতুক গোলযোগ সৃষ্টি করা, অন্যায়ভাবে কারো রক্ত ঝরানো এবং মুসলিম কিংবা কাফের কারো প্রতি যুলুম করা থেকে বিরত থকবেন।

তোরাবোরা যুদ্ধের সময় দল দুইটির অবস্থান পরিপূর্ণ স্পষ্ট ছিলো। উভয় দলের অবস্থান নিয়ে কোন ধরনের ধুম্রজাল সৃষ্টি হয়নি। কারণ এক দিকে ছিলো ক্রুসেডার আমেরিকা, তার মিত্র বাহিনী ও তার দোসরদের শিবির। অপর দিকে ছিলো আমেরিকার চির শত্রু মুহাজির ও আনসার মুজাহিদদের শিবির।

আমেরিকা তার চল্লিশেরও অধিক মিত্র দেশসহ আফগানের মাটিতে পা রেখেছে। মিত্র বাহিনীতে যেমন ক্রুসেডাররা ছিলো, তেমনি ছিলো মুসলমানদের উপর চেপে বসে থাকা অনেক দালাল শাসক। যেমন: মিশরের হোসনি মুবারক, আলে সউদের সরকার, বাশার আল আসাদ, উপসাগরীয় অঞ্চলের শাসকবর্গ এবং ঘুষখোর গাদ্দার পারভেজ মোশাররফের সরকার।

আফগান জিহাদে আমেরিকান ন্যাটো জোটের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার ছিলো তুর্কি প্রশাসন। এরা আফগানিস্তান ও সোমালিয়ায় মুসলিম হত্যাকারী, ইজরাইলকে স্বীকৃতিদানকারী, আমেরিকান বাহিনীকে আমন্ত্রণকারী, সেক্যুলারিজমের প্রতি আহবানকারী, সেক্যুলারের ধ্বজাধারী, লম্পট, জালিম আব্দুর রশিদ দোস্তমের (প্রাক্তন আফগানিস্তানের উপরাষ্ট্রপতি) মদদদাতা।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, যখন স্বয়ং আমেরিকা আফগান ছেড়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে সন্ধিচুক্তির চেষ্টা করছে তখনও এই তুর্কি সরকার আফগানের পুতুল সরকার (গানী সরকারকে) সহায়তা করার লক্ষ্যে আফগানিস্তানে আরও দুই বছর পর্যন্ত তুর্কি বাহিনীর অবস্থানের মেয়াদ বাড়ানোর ঘোষণা দিচ্ছে!

আমাদের মুসলিম দেশের জবরদখলকারী দালাল শাসকরা বাস্তবে বিশ্বের মোড়ল কাফেরদের সাহায্যকারী। যদিও তারা কখনো কখনো কোন এক পর্যায়ে মুজাহিদদের সাহায্য করে থাকে। সুতরাং এই বাস্তবতা সকল মুজাহিদ ও মুসলমানদের বুঝতে হবে।

কখনো কখনো এসব শাসকদের পরষ্পরের দ্বন্দ্বের কারণে মুজাহিদদের ও মুসলমানদের উপকার হয়। কিন্তু সবচেয়ে বড় আপদের কারণ হলো ঐ সমস্ত ব্যক্তিরা, যারা খেয়ে না খেয়ে তাদের প্রশংসা করে এবং এ বলে সাধারণ জনগণকে প্রবোধ দেয় যে, এরাই হলো জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা দানকারী সৎ শাসক। তাই মুজাহিদ ভাইসহ সকল মুসলমানদের কর্তব্য হলো, কোরআন সুন্নাহ ভালোভাবে অধ্যায়ন করে কাফেরদের দোসর মুনাফিকদের চরিত্র সম্পর্কে অবগতি লাভ করা, যাতে এই সকল মুনাফিকরা মুসলমানদের জন্য দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষতির কারণ হতে না পারে।

অপরদিকে ধূর্ত ও ধোঁকাবাজ ইরানও কম করেনি। তারা তো ইসলামী ইমারতের অবস্থান সনাক্তকারী ম্যাপগুলো সরাসরি আমেরিকার হাতে তুলে দিয়েছিল। এই ইরানই আল কায়দার বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার চালিয়ে আসছে যে, আল কায়দা মূলত আমেরিকা ও ইজরাইলের প্রজেক্ট। তারা আল কায়দার বিরুদ্ধে গুরুতর এই অপবাদ দেয় যে, আল কায়দা আমেরিকা ও ইজরাইলের সাথে বসে বাহরাইনের উপর আক্রমনের ছক তৈরী করেছে। অথচ আজ অবদি এমন কিছুই ঘটেনি।

ইরানের মুখপাত্র এতটুকু মিথ্যা প্রচারণা করেই ক্ষান্ত হয় নি। বরং একের পর এক মিথ্যচার করেই যাচ্ছে। এখন আমরা অপেক্ষায় আছি কখন তারা বলবে যে, আল কায়দা আমেরিকার সাথে আঁতাত করে পেন্টাগনে হামলা চালিয়েছিল।

এছাড়া কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবীর আমেরিকান দূতাবাসে, তানজানিয়ার বৃহত্তর শহর ও প্রশাসনিক রাজধানী দারুস সালামে, "ইউ.এস.এস কোলে" (ক্ষেপানাস্ত্র বহণকারী আমেরিকান জাহাজে), "এল ঘ্রিবা সিনাগগ[1] (El Ghriba Synagogue)" সহ কেনিয়ায় "এল.আল (EL AL)" (ইজরাইল এয়ারলাইন্স লিমেটেড) এর বিমানেও কি আমেরিকা ও ইজরাইলের যোগসাজশে আল কায়দা আক্রমণ করেছে!?

নাকি তোরাবোরা পাহাড়ে আল কায়দা নেতাদের অবস্থানকালীন সময়ে, আমেরিকা ও ইজরাইলের সাথে আঁতাত করে "শার্লি হেবদো" পত্রিকা অফিসে হামলা করা হয়েছিল!? আমেরিকা ও ইজরাইলের সাথে আঁতাত করে আর কী কী হামলা চালিয়েছে আল কায়দা?

তোরাবোরা পাহাড়ে বোমা বর্ষণের ফলে এবং পাকিস্তানের নিরাপত্তা সরঞ্জামাদী উঠিয়ে নেয়ার পর – আশ্রয়স্থল খোঁজা আল কায়দা সদস্য, বন্দী, বিধবা নারী ও বাবাহারা সন্তানদের জন্য পাকিস্তান প্রশাসন সীমান্ত খুলে দিয়েছে ঠিকই। কিন্তু

---

[1] এটি 'জিরবা সিনাগগ' নামে পরিচিত। তিউনিসিয়ার এক দ্বীপে ইহুদিদের গ্রামে অবস্থিত একটি উপসনালয়।

তারপর পনেরো বছর পর্যন্ত আবারও তাদের বন্দী করে রেখেছে। আর বর্তমানে তারাই শ্লোগান দিচ্ছে "আমেরিকা নিপাত যাক", "ইজরাইল নিপাত যাক"।

আবার সে সময়ে আমেরিকান মেরিন সৈন্যদের পক্ষে এই ফতোয়াও প্রচার করা হয়েছে যে, মেরিন বাহিনীতে চাকরিরত কোন মুসলিম যদি আশঙ্কা করে যে, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে পরিচালিত মার্কিন যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলে তার চাকরি চলে যাবে, তাহলে তার জন্য মুজাহিদদের বিরুদ্ধে উক্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার বৈধতা রয়েছে।

সেই হামলায় সমানভাবে অংশ নিয়েছে – মুসলিম ব্রাদারহুডের মত আন্তর্জাতিক সংগঠনের সমর্থনপুষ্ট সাইয়াফ ও রাব্বানীর মতো বড় বড় ব্যক্তিবর্গের দল।

একদিকে ছিলো তাদের গর্ব, অহংকার ও দাম্ভিকতা। তারা ছিলো সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত। তাদের ধোঁকা ও ষড়যন্ত্রের কোন ক্রুটি ছিলো না। তদ্রূপ লোভ ও ভ্রষ্টতার ক্ষেত্রেও কোন কমতি ছিলো না।

অপরদিকে মুসলিম মুজাহিদরা ছিলেন অবরুদ্ধ এবং দুর্বল। কিন্তু তার পরও তারা ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাদের নিজেদের বিষয় খালেকের উপর ছেড়ে দিয়েছেন এবং তাঁর উপর ভরসা করে গেছেন। জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটুকু পর্যন্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছেন নিজেদেরকে।

আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

"যখন মুমিনরা শত্রুবাহিনীকে দেখল, তখন বলল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল এরই ওয়াদা আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই বৃদ্ধি পেল"। (সূরা আহযাব ৩৩:২২)

আর আমার বিশ্বাস আল্লাহ তাদের মাঝে এই আয়াত বাস্তবায়ন করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

"মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি।" (সূরা আহযাব ৩৩:২৩)

মুজাহিদরা আমেরিকাতে আঘাত হানার সকল কারণ প্রকাশ করার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। আমেরিকার নেতৃস্থানীয় অপরাধীদের অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে মুসলিমদের পক্ষে প্রতিরক্ষার জন্য মুজাহিদরা আমেরিকায় হামলা করেন।

দ্বিতীয় শিক্ষা

তোরাবোরা পাহাড়ে আমাদের দ্বিতীয় শিক্ষা হলো; এই যুদ্ধে সাহায্য ও বিজয়ের অন্যতম কারণ হচ্ছে- শত্রুর বিরুদ্ধে মুজাহিদদের ঐক্যবদ্ধ থাকা। শাইখ রহিমাহুল্লাহও বিভিন্ন জটিল থেকে জটিলতর পরিস্থিতি সত্ত্বেও বিশ্বের সকল মুজাহিদদেরকে সংঘবদ্ধ করে এবং একই সারিতে নিয়ে আসার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন।

ইরশাদ হচ্ছে:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ

"আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসাগালানো প্রাচীর"। (সূরা আস সফ ৬১:৪)

আরো ইরশাদ হচ্ছে:

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ ۚ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

"আর আল্লাহ সে ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন, যখন তোমরা তাঁরই নির্দেশে ওদের খতম করছিলে। এমনকি যখন তোমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছ ও কর্তব্য স্থির করার ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হয়েছ। আর যা তোমরা চাইতে তা দেখার পর কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেছ, তাতে তোমাদের কারো কাম্য ছিল দুনিয়া আর কারো বা কাম্য ছিল আখেরাত। অতঃপর তোমাদিগকে সরিয়ে দিলেন ওদের উপর থেকে যাতে তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন। বস্তুতঃ তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করেছেন। আর আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল"। (সূরা আল-ইমরান ৩:১৫২)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর, যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার। আর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন ধৈর্য্যশীলদের সাথে"। (সূরা আল-আনফাল ৮:৪৫-৪৬)

তারপর শাইখ রহিমাহুল্লাহ এই কর্মপদ্ধতির উপর ভিত্তি করে তার সঙ্গীদেরসহ সংঘবদ্ধ করতে শুরু করেন। একটু একটু করে অন্যান্য মুজাহিদ ভাইদের সংঘবদ্ধ করে পৃথিবীর সকল মুজাহিদদেরকে একই সারিতে নিয়ে আসতে থাকেন। আর আমাদের এই সংঘবদ্ধ হওয়া ও একই কাতারে সারিবদ্ধ হওয়াটা সুপার পাওয়ার আমেরিকার জন্য সবচেয়ে বড় ভীতির কারণ ছিল। তাই আমেরিকা আমাদের এই আদর্শের বিরুদ্ধে লড়াই করার সর্বাত্মক চেষ্টা শুরু করে। কিন্তু শাইখ রহিমাহুল্লাহ এই আদর্শের উপর অবিচল থেকে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন।

হায় আফসোস! শাইখ রহিমাহুল্লাহ’র মৃত্যুর পর নতুন কিছু দলের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। তারা এই আদর্শ থেকে সরে ডানে-বামে ছুটাছুটি করেছে। তারা তাদের মূল আদর্শের কবর রচনা করেছে। তাদের একজন খেলাফতের দাবি করে বসল এবং তার খেলাফতকে অস্বীকারকারী সবাইকে কাফের ফতোয়া দেয়া শুরু করল। আরেকজন নেতৃত্বের দাবি করে বিভিন্ন হারাম কাজের সাথে জড়িয়ে পড়ল। এর দ্বারা তারা শত্রুদের হয়ে তাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার চাইতেও বেশি উপকার করেছে।

তবে হক পথের মুজাহিদদের কারণে আমেরিকাসহ ইউরোপের সকল কুফ্ফারদের মাঝে এই ভীতি ও আতংক ছড়িয়ে পড়েছে যে – তুর্কিস্তান থেকে পশ্চিম আফ্রিকা, ককেশাশ থেকে সোমালিয়া পর্যন্ত সকল মুজাহিদদের এই অগ্রবর্তী দল একই সারিতে, একই কাতারে সারিবদ্ধ হয়ে, একজোটে – বিশ্ব কুফুরি শক্তি ও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে হামলা করবে ইনশা আল্লাহ।

তৃতীয় শিক্ষা

তোরাবোরা পাহাড়ে আমাদের তৃতীয় শিক্ষা হলো; নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা জুলুমবাজ ও অহংকারী গোষ্ঠীর জুলুম-নির্যাতন থেকে ছোট মুমিন দলকে মুক্তি দিতে সক্ষম। আমেরিকা ও তার ন্যাটো জোট তোরাবোরা পাহাড়ে মাত্র তিনশত মুজাহিদকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়নি! সুপার পাওয়ার আমেরিকা, তার ন্যাটো জোট ও স্থানীয় দালাল শাসকের বাহিনীরা, সবাই মিলে মুজাহিদদেরকে তোরাবোরা পাহাড়ের চতুর্দিক থেকে অবরুদ্ধ করে ফেলে এবং উপর থেকে জঙ্গী বিমানের মাধ্যমে তোরাবোরা পাহাড়ে অনবরত বোম্বিং করতে থাকে। কিন্তু তারপরও মুজাহিদরা আত্মসমর্পণ করেনি। ফলে তারা মুজাহিদদের আটক ও বন্দী করতে ব্যর্থ হয়।

আমি শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ'কে জিজ্ঞেস করেছিলাম; এই অবরোধ থেকে বের হওয়ার কোন পথ আছে কিনা? এই পাহাড় পর্বত বেয়ে কি আমরা পাকিস্তানে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারবোনা! তখন শাইখ রহিমাহুল্লাহ একজন আনসার তলব করলেন। অতঃপর তাকে পাকিস্তানে যাওয়ার পথ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তখন আনসার আমাদের পূর্ব ও দক্ষিণের সারি সারি স্পিনঘর পাহাড়ের[2] চূড়া এর দিকে হাতের ইশারা করে দেখালেন। শাইখ রহিমাহুল্লাহ বললেন, 'আপনি এই দিকে ইশারা করে কী বুঝাতে চাচ্ছেন একটু খুলে বলেন, তখন আনসার বললেন, "আপনি বরফে ঘেরা এসব পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখুন তাতে কোন পথই খোলা নেই। তবে বসন্তকালে বরফগুলো গলে গেলে পথ বের হবে"।

সুতরাং আমরা বর্তমানে ত্রিমুখী অবরোধের স্বীকার। একদিকে আকাশ পথে জঙ্গী বিমানের মহড়া। দ্বিতীয়ত, আমাদেরকে ক্রুসেডার ও তার ভাড়াটে সৈনিকদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলা। তৃতীয়ত, আমাদের বেষ্টন করে আছে বরফ আচ্ছাদিত পাহাড়ের মজবুত প্রাচীর। পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম যে, প্রায় এক সপ্তাহ পরে তুষারের ঝড় হতে পারে বলে আমরা আশাবাদী ছিলাম। কেননা এই অবরোধ ছিলো ১২ই ডিসেম্বর ২০০১ সালে।

শাইখ রহিমাহুল্লাহ আমাদেরকে নেতৃত্ব প্রদান করে যান। এ কঠিন পরিস্থিতিতেও আল্লাহ তায়ালা মুজাহিদ বাহিনীর বিরাট অংশকে আফগানিস্তান থেকে উদ্ধার করেছেন। তবে পাকিস্তানের গাদ্দারির কারনে মুজাহিদ বাহিনীর প্রায় অর্ধেক কারাগারে বন্দী হয়েছেন। তোরাবোরা যুদ্ধের পর দীর্ঘ একদশক পর্যন্ত শাইখ রহিমাহুল্লাহ অবিরাম জিহাদের কাজ চালিয়ে যান। তাই তোরাবোরা যুদ্ধের ঘটনাবলীর স্মৃতিচারণ দুর্বল মুসলিমের হৃদয়ে এই আশা জাগায় যে, আল্লাহ তায়ালা

---

[2] স্পিনঘর' – পশতুভাষায় বরফের পাহাড় চূড়াকে 'স্পিনঘর' বলে

সংখ্যাগরিষ্ঠ জুলুমবাজ কাফেরদের থেকে সংখ্যালঘু মুসলিমদের দলকে মুক্তি দিতে ও সাহায্য করতে সক্ষম। ইরশাদ হচ্ছে-

كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

“সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবেলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে। আর যারা ধৈর্য্যশীল আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন”। (সূরা বাকারা 2:২৪৯)

আরব বসন্ত ও “রাবেয়া এবং আন-নাহদা” চত্বরে এবং “রিপাবলিক গার্ড” সদর দপ্তরসহ বিভিন্ন জায়গায় ঘটে যাওয়া লোমহর্ষক দুর্ঘটনার দৃশ্য এখনো আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। এসবস্থানে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভকারীরা মারত্মকভাবে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু আমার বুঝে আসে না এই দু:সময়ে কিভাবে তাদের নেতৃত্ব নিজেদেরকে বিনা মূল্যে শত্রুদের কাছে সমর্পণ করেছে?

যদিও আল্লাহ ভাগ্যে যা রেখেছেন তাই ঘটেছে। যদি এই দলটি আল্লাহর প্রতি ভরসাকারী মুজাহিদদের নেতৃত্ব পেত, সেকুলার জীবনব্যবস্থা ও সেকুলার সংবিধানের সামনে তারা নতি স্বীকার না করতো, ফেতনা (শিরক) নির্মূল হয়ে পূর্ণ দ্বীন আল্লাহর জন্য হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ-জিহাদ চালিয়ে যেত, অন্যান্যদেরকে জিহাদের জন্য সংঘবদ্ধ করতো এবং এই নাস্তিক, মুরতাদ জালেম শাসকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সাধ্যমত প্রস্তুতি গ্রহণ করতো – তাহলে আমার ধারণা মতে – অদৃশ্য বিষয় একমাত্র আল্লাহই জানেন- চিত্রটি পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করতে পারতো। আর সেটি হল – নাস্তিক, মুরতাদ ও অপরাধী শত্রুদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দিয়ে শুধু শুধু শহীদদের সারি বৃদ্ধি পেত না।

তাই আমার মতামত হলো, তোরাবোরা যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহে দুর্বল মুসলিমদের অন্তরে আশা জাগানোর মতো যথেষ্ট উপাদান বিদ্যমান রয়েছে। তা এভাবে যে, মানব ইতিহাসে যুগ যুগ ধরে দুর্বলরা আল্লাহর নুসরতে ও তার আদেশে বিশ্বের পরাশক্তির বিরুদ্ধে জয়লাভ করে আসছে।

তাই দলমত নির্বেশেষে মুসলিম উম্মাহর সকলকে আকিদাগত, দাওয়াতি, ইলমী ও রাজনৈতিকভাবে যথাসাধ্য যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। তাগুতের সামনে আত্মসমর্পণকারী ফলাফল বিহীন ভঙ্গুর পথ ও পন্থা থেকে পূর্ণভাবে মুক্তি লাভের জন্য, মুসলিম উম্মাহকে জাগরণের যুদ্ধে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে একে অপরের দিকে সাহয্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

আরব বসন্তে ভুল পথ-পন্থা ছিল প্রচুর। কেউ কেউ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে। তারা দেশের পক্ষে এই বলে আওয়াজ তুলেছে যে, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের মাঝে সমন্বয় করে দেশ পুনর্গঠন করতে হবে। যার অবধারিত ফলাফল হলো, সেখানে জনগণের শাসন চলবে, আল্লাহর শাসন চলবে না। যেই দেশের সংবিধানের মূলভিত্তি মুসলিম ভ্রাতৃত্ব না হয়ে স্বদেশপ্রীতি হবে, যাদের চেতনা হবে অখণ্ড মুসলিম সাম্রাজ্যের পরিবর্তে খণ্ড খণ্ড মুসলিম রাষ্ট্র। এই কুসংস্কারমূলক চুক্তি ইসলামী ইতিহাসে কবে সংগঠিত হয়েছে তা আমার জানা নেই।

অথচ তারা আগ বাড়িয়ে বলে যে, মুসলিম, ইয়াহুদী ও অন্যান্যদের মাঝে সংগঠিত মদিনা সনদে নাকি তাদের কুসংস্কার মূলক এই চুক্তির প্রমাণ রয়েছে। অথচ এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা দাবি। কেননা “যেকোন বিরোধপূর্ণ বিষয়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকার হবে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। এই বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে মদিনা সনদ স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত হয়। অর্থাৎ “সব শাসন ক্ষমতার উর্ধ্বে হলো আল্লাহর শাসন ক্ষমতা” এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে মদিনা সনদের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জনগনের কাছে বিচার প্রার্থনাকারী জাতীয়তাবাদের এসব প্রচারকদের কর্মপদ্ধতি

কিতাবুল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতসমুহের সাথে পূর্ণ সাংঘর্ষিক। কোরআনে কারীমের ইরশাদ হচ্ছে-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমরা মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে"। (সূরা আন-নিসা ৪:৬৫)

আরো ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

"তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর, তার ফয়সালা আল্লাহর কাছে সোপর্দ। ইনিই আল্লাহ আমার পালনকর্তা আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তাঁরই অভিমুখী হই"। (সূরা আশ-শুরা ৪২:১০)

তাছাড়া আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে ফয়সালা চাওয়াকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা 'জাহিলিয়্যাতের শাসন' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন,

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۝ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন-যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহ তাদেরকে তাদের গোনাহের কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান। তারা কি জাহেলিয়াত

আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে?" (সূরা মায়েদা ৫:৪৯-৫০)

এসমস্ত আল্লাহর বান্দারা তাদের শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচিকে গুলি থেকে অধিক কার্যকরী ও শক্তিশালী মনে করে। কিন্তু তাগুত বাহিনীর প্রথম গুলিতেই তাদের এই শান্তিপূর্ণ অবস্থান কোথায় যে হারিয়ে যায়? অথচ এই কর্মপদ্ধতি দ্বীন, শরিয়ত, সমাজ এবং ফিতরতের সাথে সাংঘর্ষিক। এই কর্মপদ্ধতির কুফল হলো, অধিকাংশ জনগণ আল্লাহর বিধানের উপরে জায়নিষ্ট ক্রুসেডার এবং মুসলিমদের রক্তখেকো, ধূর্ত সেকুলার ও জাতীয়তাবাদী মুসলিম রাষ্ট্রের দালাল শাসকদের আদেশ-নিষেধকে প্রধান্য দেয়।

অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

"বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদেরকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়"। (সূরা বাকারা ২:২১৭)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

"আর লড়াই কর আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আর তাদেরকে হত্যাকর যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। বস্তুতঃ ফেতনা ফাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদুল হারামের নিকটে যতক্ষণ না তারা তোমাদের

সাথে সেখানে লড়াই করে। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে। তাহলে তাদেরকে হত্যা কর। এই হল কাফেরদের শাস্তি। আর তারা যদি বিরত থাকে, তাহলে আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু"। (সূরা বাকারা ২:১৯০-১৯২)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

"আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায় তাহলে কারো প্রতি কোন জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা যালেম (তাদের ব্যাপারে আলাদা)"। (সূরা বাকারা ২:১৯৩)

সেখানে আরেকটি সমস্যা ছিল। তারা আলওয়ালা ওয়ালবারা (আল্লাহর জন্য শত্রুতা ও মিত্রতা) এর মাসআলাকে হালকা করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং আলওয়ালা ওয়ালবারা (শত্রুতা-মিত্রতা) এর বন্ধনকে ভেঙ্গে তার মূল ভাবটি বিকৃত করে দিয়েছে। তাই শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক এমন সংবিধানের রক্ষক, অন্যায়-জুলুমের রাষ্ট্রকে সহায়তাকারী, যুগ যুগ ধরে মুসলিমদের নিধনকারী যায়নিষ্ট আমেরিকান বাহিনীকে নিজেদের ভাই মনে করে বসলো! তাদের অনেকেই তখন বলেছে; 'আমাদের মাঝে এবং তাদের মাঝে কোন যুদ্ধ নেই'। অথচ এই কর্মপদ্ধতি কিতাবুল্লাহর সাথে সুস্পষ্ট সাংঘর্ষিক।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন

এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে"। (সূরা মুজাদালা ৫৮:২২)

আরো ইরশাদ হচ্ছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

"হে মুমিনগণ, আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না। আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও"। (সূরা মায়েদা ৫:৫৭)

আবারো ইরশাদ হচ্ছে,

لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿﴾ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿﴾

"ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কৃত করেছে এবং বহিস্কারকার্যে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই জালেম"। (সূরা মুমতাহিনা ৬০:৮-৯)

এই আদর্শ লালণকারীদের ধারণা হলো, এই বাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনী (তাদের ধারণা মতে) তারা কোন মুসলিমকে হত্যা করার পরও তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা নাকি আমাদের উপর আবশ্যক হবে না। তারা বলে, মুসলিমদের কর্তব্য হলো,

কুফফারদের কাছে আত্মসমর্পণ করা। অথচ কোরআন আমাদেরকে ভিন্ন কিছু বলে। ইরশাদ হচ্ছে-

وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ﴿﴾ أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ﴿﴾ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ﴿﴾ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاء وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴿﴾

"আর যদি ভঙ্গ করে তারা তাদের শপথ প্রতিশ্রুতির পর এবং বিদ্রুপ করে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে, তবে কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। কারণ, এদের কোন শপথ নেই যাতে তারা ফিরে আসে। (12) তোমরা কি সেই দলের সাথে যুদ্ধ করবে না; যারা ভঙ্গ করেছে নিজেদের শপথ এবং সঙ্কল্প নিয়েছে রসূলকে বহিস্কারের? আর এরাই প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ, যদি তোমরা মুমিন হও। যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন। এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবে, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়"। (সূরা আত-তাওবা ৯:১২-১৫)

আরো ইরশাদ হয়েছে;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُواْ جَمِيعًا﴿﴾ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا﴿﴾ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ الله لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا﴿﴾ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلْ أَو يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴿﴾ وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا﴿﴾ الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴿﴾

“হে ঈমানদারগণ! নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও এবং পৃথক পৃথক সৈন্যদলে কিংবা সমবেতভাবে বেরিয়ে পড়। (71) আর তোমাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ রয়েছে, যারা অবশ্য বিলম্ব করবে এবং তোমাদের উপর কোন বিপদ উপস্থিত হলে বলবে, আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে যাইনি। (72) পক্ষান্তরে তোমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন অনুগ্রহ আসলে তারা এমনভাবে বলতে শুরু করবে যেন তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে কোন মিত্রতাই ছিল না। (বলবে) হায়, আমি যদি তাদের সাথে থাকতাম, তাহলে আমিও যে সফলতা লাভ করতাম। (73) কাজেই আল্লাহর কাছে যারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয় তাদের জিহাদ করাই কর্তব্য। বস্তুতঃ যারা আল্লাহর রাহে লড়াই করে অতঃপর মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহাপুণ্য দান করব। (74) আর তোমাদের কি হল যে, তেমারা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে, অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও। (75) যারা ঈমানদার তারা যে, জিহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে সুতরাং তোমরা জিহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল”। (76) (সূরা আন-নিসা ৪:৭১-৭৬)

কোরআনের মানহাজই (কর্মপন্থাই) হল সম্মানের মানহাজ এবং অন্যায়-জুলুমকে প্রতিহত করার একমাত্র পথ। কুফর, শিরক ও দৃশ্য-অদৃশ্য সব মূর্তিকে গুড়িয়ে দেয়ার কার্যকরি পথ। কল্যাণ ও ইনাসাফের পথ। সম্মান ও মর্যাদার প্রতি

আহবানকারীদের পথ। আল্লাহর নাযিলকৃত শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করার একমাত্র উত্তম উপায়।

কোরআনে বর্ণিত পথ ও পন্থা – কখনোই বাতিলের সামনে নতী স্বীকারের পথ নয়। এটি বাতিলের উপর সন্তুষ্ট হওয়ার পথও নয়। আর তাদের শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচির পথ, ক্ষণিকের এই জীবনে বেঁচে থাকার জন্যও কোন শান্তিপূর্ণ পথ নয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ﴿﴾ إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴿﴾

“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান”। (সূরা আত-তাওবা ৯:৩৮-৩৯)

আমরা বুঝতে পারলাম, জিহাদ ছেড়ে দেয়ার অন্যতম শাস্তি হলো, আল্লাহ তায়ালা আমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করবেন।

তাই আমার মুসলিম ভাইয়েরা শুনুন!

যখন আমরা বিজয় ও সাহয্যের প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করবো, তখন এমন অকার্যকর নেতৃত্ব পরিহার করতে হবে, যার অনুসরণ করলে লড়াইয়ের ময়দান থেকে পালিয়ে যেতে হয়। জাতীয়তাবাদের প্রতি আহবানকারীদেরকে এড়িয়ে চলতে হবে। আমাদেরকে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে – মুসলিমদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ

করতে এবং তাওহীদের কালিমার ছায়াতলে একত্রিত করতে। এই কালিমার খাতিরে আমরা বিভিন্ন দলে ও উপদলে বিভক্ত হওয়া থেকে বিরত থাকবো। আমাদের পরাজয়ের সব কারণ ক্ষতিয়ে দেখবো। তারপর এক আল্লাহর উপর ভরসা করে সুযোগ পেলেই জিহাদে অংশগ্রহণ করব। আর মনে রাখব – প্রতিটি ইসলামী ভূখণ্ড মিলে একটি মাত্র ভূখণ্ড।

রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন,

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا

“আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের যিম্মাদার নন! আর আপনি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ খর্ব করে দেবেন। আর আল্লাহ শক্তি-সামর্থের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা”। (সূরা আন-নিসা ৪:৮৪)

তিনি আরো বলেন

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শুত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও, যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না”। (সূরা আনফাল ৮:৬০)

আমাদের মুসলিম বিশ্বে, বিশেষত আরব বিপ্লবের দেশগুলোতে – দালাল শাসকদের অন্যায়-অবিচারের কোন মাত্রা নেই। তবে তারা কোন অপরাজেয় শক্তি নয়। তারা

অপ্রতিরোধ্যও নয়। কারণ এসব অপরাধীরা যতই শক্তি অর্জন করুক না কেন দিনশেষে তারা সকলেই মানুষ। না তারা কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে, না রিজিক দিতে পারে, না পারে কোন কিছুকে জীবন দিতে। আর তারা চাইলেও কাউকে মৃত্যু দিতে পারে না।

চতুর্থ শিক্ষা

তোরাবোরা পাহাড়ে আমাদের চতুর্থ শিক্ষা হলো; দলের নেতাকে পরিবর্তনশীল পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার পর বা কোন দিকে ঝুঁকে পড়ার পর তার উপর জমে না থাকা। বরং কাজের স্বভাবজাত ধারার সাথে মিল রেখে প্রয়োজনে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার সৎ সাহস থাকতে হবে।

আমি শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহর মধ্যে এই গুণটি পেয়েছি। শাইখ যখন তোরাবোরা পাহাড়ের অবস্থানকে – যুদ্ধের স্বভাবজাত পরিবর্তনশীল ধারার সাথে অসামঞ্জস্বপূর্ণ দেখতে পেলেন, তখন তোরাবোরা পাহাড় থেকে সরে যাওয়ার লক্ষ্যে চুক্তিকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করলেন। যুগান্তকারী এই সিদ্ধান্তটি কুফফার মোড়লদের বিরুদ্ধে এই লড়াইকে দীর্ঘস্থায়ী করার ভূমিকা স্বরূপ কাজ করেছে। এক জায়গায় অবস্থান করে লড়াই করতে থাকা ফোর্থ জেনারেশন (চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ) যুদ্ধনীতির সাথে সাংঘর্ষিক।

মুজাহিদদের একটি দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী ক্রুসেড যুদ্ধ। সুতরাং যে পক্ষ তার শত্রুকে যত বেশী ক্লান্ত করে তুলতে পারবে বা যত বেশী ক্ষয়ক্ষতি করতে পারবে, সেই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয় লাভ করতে পারবে।

লুটতরাজ, লুন্ঠন ও দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া উচিৎ নয়। কারণ যুদ্ধের সাথে এসবের মৌলিক কোন সম্পর্ক নেই। একজন হয়তো খলীফা

হওয়ার লোভ করবে, অপরজন লোভ করবে – নেতৃত্ব বা ক্ষমতার। এসব লোভ-লালসা করা থেকে দূরে থাকতে হবে। কারণ লোভ-লালসার এই পথ ধরলেই শরিয়তের বিধানগুলো উপেক্ষা করতে হবে। বিভিন্ন হারাম কাজে লিপ্ত হতে হবে। বহু মানুষের অযথা প্রাণ যাবে। বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা হবে।

অপরদিকে আমাদের শত্রুরা আমাদের মধ্যে এসব ঘটার কামনা করে। একপর্যায়ে জিহাদ চর্চার নামের এই নিরর্থক কাজকে মুসলিম জাতি ঘৃণা করা শুরু করে। সবশেষে জিহাদের পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

পঞ্চম শিক্ষা

তোরাবোরা পাহাড়ে আমাদের পঞ্চম শিক্ষা হলো – শত্রুপক্ষের যোগাযোগ মাধ্যম ও তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা। আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, শত্রুর যোগাযোগ মাধ্যমের উপর গবেষণা করে 'মারকাজুশ্ শাইখ ইবনুশ্ শাইখ আল লীবী'র মুজাহিদ ভাইয়েরা বিভিন্ন সংগঠনে অনুপ্রবেশকারীদের প্রবেশ করানোর পথ আবিস্কার করেছেন। এপথ ধরে তারা অনেক মুজাহিদ ভাইকে কাফেরদের বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করাতে সক্ষম হয়েছেন।

ষষ্ঠ শিক্ষা

তোরাবোরা পাহাড়ে আমাদের ষষ্ঠ শিক্ষা হলো – মুজাহিদদেরকে মৌলিকভাবে পর্যাপ্ত অস্ত্র সামগ্রী ও গোলাবারুদ সঞ্চয় করতে আগ্রহী হতে হবে এবং কঠিন পরিস্থিতিতে সম্পদের কোরবানী দিতে হবে।

শাইখ রহিমাহুল্লাহ শেষবারের মতো তোরাবোরা পাহড়ে আরোহণ করার পূর্বে কোন ভাই অভিযোগের সূরে বললেন যে, 'আমাদের কেউ কেউ চড়া মূল্য দিয়ে কামান ক্রয় করছে!'

তখন শাইখ রহিমাহুল্লাহ আমাকে বললেন, ‘এই ভাইতো আমাদের জন্য বেশ কয়েকটি কামানের ব্যবস্থা করেছেন। অপরদিকে জিহাদের প্রতি আগ্রহী ভাইয়েরা এখন পর্যন্ত একটি কামানের ব্যবস্থা করতে পারেনি। আমাদের যেসব ভাইয়েরা আমাদেরকে সম্পদ দিয়ে সহায়তা করেছেন অথচ সেই সম্পদ আমাদের হাতে আমানত হিসেবে রয়ে গিয়েছে এবং চড়া মূল্যের অজুহাতে আমরা কামান কিনতে পারিনি। যখন বিপর্যয় নেমে আসবে, তখন সেসকল ভাইকে আমরা কি বলে ওজর দেখাবো’?

আমি শাইখ রহিমাহুল্লাহ’কে দেখেছি – তোরাবোরা পাহাড়ে অবস্থানকালে তিনি কখনো গোলা-বারুদের মূল্য নিয়ে দামাদামি করতেন না। একবার শাইখ রহিমাহুল্লাহ’র কাছে এক আনসার ভাই “আর পি জি” ক্ষেপনাস্ত্র ক্রয়ের প্রস্তাব করলেন। তখন শাইখ রহিমাহুল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে তাকে মূল্য প্রদান করেন। আমি তাঁকে বললাম, ‘দামটা অনেক বেশী হয়ে গেলো না?’ তিনি উত্তরে বললেন, ‘হতে পারে। তবে এখন মূল্য নিয়ে দামাদামি করার সময় নয়’।

সপ্তম শিক্ষা

তোরাবোরা পাহাড়ে আমাদের সপ্তম শিক্ষা হলো – মাটিতে পরিখা খননের গুরুত্ব। বোমাবর্ষনের ক্ষয়ক্ষতি থেকে মুজাহিদদের আত্মরক্ষা লাভের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে তোরাবোরা পাহাড়ে করা পরিখাগুলো।

স্বাভাবিকভাবে এসব গর্ত ও পরিখাগুলো মুজাহিদদের আশ্রয়স্থল ছিল। আর প্রতিটি গর্তে ছিল লোহার একটি করে ছোট হিটার। যার নাম আফগানরা রেখেছে “বোখারা”। এই লোহার হিটারের সাহায্যে মুজাহিদগণ নিজেদেরকে শীত থেকে রক্ষা করতেন।

বড় শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় পরিখা খননের আসবাব সামগ্রীর গুরুত্বটিও এখান থেকে ফুঠে উঠেছে। তাই একজন নেতার দায়িত্ব হলো – তার সাথীদেরকে পরিখা খননের প্রশিক্ষণ দেয়া। পাশাপাশি পরিখা খননের জন্য প্রয়োজনীয় সব যন্ত্রের ব্যবস্থা করা।

সে সময়ে তোরাবোরা পাহাড়ে অল্প সময়ে প্রচুর পরিখা খননের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। ফলে মুজাহিদ ভাইয়েরা তোরাবোরা পাহাড়ের নিকটবর্তী গ্রামের আনসারি ভাইদের সহায়তা চান। আলহামদুলিল্লাহ, অল্প সময়েই পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিখা খনন করার কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য "মাইন" পুঁতে রাখাকেও গুরুত্বপূর্ণ একটি পন্থা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

অষ্টম শিক্ষা

তোরাবোরা পাহাড়ে আমাদের অষ্টম শিক্ষা হলো – সাহায্য ও নুসরাতের জন্য লোক সংগ্রহ করা আর শত্রুর সারিকে ছত্রভঙ্গ করার লক্ষ্যে সম্পদ খরচ করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। আর এই সম্পদ হবে মূলত যাকাতেরই অংশ বিশেষ।

প্রতিরোধ যুদ্ধের ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করা কখনো কখনো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হয়ে দাড়ায়। আমাদের অবরুদ্ধ ভাইদের মধ্যে যাদের নিকট অর্থ পৌঁছানো সম্ভব হতো, তাদের কাছে আর্থিক সহযোগিতা পাঠানো হত। এই ক্ষেত্রে শাইখ রহিমাহুল্লাহ কোমলতার পরিচয় দিতেন। আমার স্মৃতিতে এখনো ভাসছে যে, শাইখ রহিমাহুল্লাহ একজনের জন্য নির্দিষ্ট অংকের সম্পদ পাঠিয়ে দূতকে বলে দিয়েছেন যে, 'তুমি তাকে বলে দিও যে, এই অর্থ তার গ্রামের এতিমদের জন্য'।

নবম শিক্ষা

তোরাবোরা যুদ্ধের নবম শিক্ষাটিও সম্পদ সংশ্লিষ্ট। আর সেটা হলো – জিহাদের পক্ষাবলম্বী আনসারদেরকে আর্থিক সহায়তা করা। আমি পঞ্চম কিস্তিতে আমাদের

সহায়তাকারী গ্রামটির গল্প উল্লেখ করেছি। শাইখ রহিমাহুল্লাহ সেই গ্রামবাসীদের থেকে জিহাদের উপর প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন। সেই গ্রামবাসীরা তাদের পরিবার-পরিজনকে বোমা বিধ্বস্ত এলাকা থেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়ার জন্য শাইখ রহিমাহুল্লাহ থেকে সময় চেয়েছিলেন। তখন শাইখ রহিমাহুল্লাহ হিজরতকারী প্রতিটি পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

দশম শিক্ষা

তোরাবোরা পাহাড়ে আমাদের দশম শিক্ষা হলো – বিরাট সংখ্যক আনসারকে জিহাদের জন্য সংগ্রহ করে রণাঙ্গন পর্যন্ত নিয়ে আসা। সম্ভব না হলে, কমপক্ষে তাদের শক্তিকে ফলপ্রসূ করা, যদিও তারা যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত না থাকে। আর এসবের জন্য আমাদের চেষ্টা করে যেতে হবে।

আর এখান থেকেই আনসার ভাইদের ও ভবিষ্যত মুজাহিদদের শক্তিগুলোকে ফলপ্রসূ করার গুরুত্বটি উঠে আসে। কারণ শাইখ রহিমাহুল্লাহ ও তার মুজাহিদ ভাইদের জন্য যারা খেদমত করে গেছেন, তাদের বহু সংখ্যক তখন রণক্ষেত্রের বাইরে ছিলেন। তারা কঠিনতর পরিস্থিতির মধ্যেও বিরাট বিরাট খেদমত করে গেছেন।

মানুষের ভালোবাসা অর্জনের জন্য উত্তম পূর্ব ইতিহাস ও আদর্শ জীবন বৃত্তান্ত থাকার গুরুত্বটিও এখান থেকে ফুটে উঠেছে।

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মানুষের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা দান করেন ও তার প্রতি অন্যদের ভালোবাসা সৃষ্টি করেন। যে ব্যক্তি বিশৃংখলা করে বেড়াবে, অন্যায় আচরণ করবে, মানুষকে গালাগালি করবে, নেয়ামতের কদর করবে না এবং নাফরমানি করবে – সে কখনো মানুষের ভালোবাসা লাভ করতে পারবে না। আর এটিই বাস্তব।

প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করে তা বহন করে আনা এবং তারপর তা গুদামজাত করে রসদের যোগান দেয়ার ক্ষেত্রে আনসারী ভাইদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আর এটি তো একেবারেই স্পষ্ট যে, যুদ্ধের মাঠে টিকে থাকা ও অবিচল থাকার অন্যতম একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে, দীর্ঘস্থায়ী একটি যুদ্ধের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে রসদ সরবরাহ জারি থাকা।

একাদশ শিক্ষা

তোরাবোরা পাহাড়ে আমাদের একাদশ শিক্ষা হলো – শত্রুকে নসীহতের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া, যদিও তারা সীমাহীন অপরাধী হয়।

শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ’র একবারের ঘটনা। তিনি প্রিয় শাইখ দ্বীন মুহাম্মদের জন্য নসীহাহ বার্তা পাঠান। কিন্তু দ্বীন মুহাম্মদ এই নসীহাহ বার্তা দেখে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে এই উপদেশকে প্রত্যাখ্যান করে। অন্যদিকে অবরুদ্ধ হয়ে থাকা অন্য আরেক শাইখ, শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ’র নসীহায় সাড়া দিয়ে ওয়াদা করেছিলেন যে, তার পক্ষ থেকে কোন ধরণের ক্ষতির আশঙ্কা না করতে।

দ্বাদশ শিক্ষা

তোরাবোরা পাহাড়ে আমাদের দ্বাদশ শিক্ষা হলো – মুজাহিদদের অবস্থান, তাদের আশ্রয় ঘাটি, মুজাহিদদের জনসংখ্যা, নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি – এসব যাবতীয় তথ্য শত্রুদের থেকে গোপন রাখার ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

ত্রয়োদশ শিক্ষা

তোরাবোরা পাহাড়ে আমাদের ত্রয়োদশ শিক্ষা হলো – শত্রুদের কৌশলের (তথা; তারা আত্মসমর্পণ করতে চাওয়া এবং নেতৃস্থানীয় মুজাহিদদের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাওয়া) ধোঁকায় না পড়া। যেমন, মুনাফিকদের পক্ষ থেকে মুজাহিদদেরকে জাতিসংঘের কাছে আত্মসমর্পণ করার প্রস্তাব উত্থাপন, মুহাম্মদ জামানের পক্ষ থেকে

শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ'কে আশ্রয় দান করা এবং নিরাপত্তা দান করার প্রস্তাব উত্থাপন – এ ধরণের ধোঁকার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

চতুর্দশ শিক্ষা

তোরাবোরা পাহাড়ে আমাদের চতুর্দশ শিক্ষা হলো – মুজাহিদদের মাঝে নেতৃবৃন্দের উপস্থিত থাকা, মুজাহিদদের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং কঠিন সময়ে মুজাহিদদের সাথে কাজে অংশগ্রহণ করা।

এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো – 'মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ' সাধারণ জনগণের সামনে আকিদা-বিশ্বাস, অবিচলতা, চারিত্রিক মাধুর্যতা এবং বিশ্বস্ততার উত্তম দৃষ্টান্ত হবেন। একমাত্র নিষ্ঠা ও অবিচলতার সাথে নেতৃত্ব প্রদানের ফলে মুজাহিদ ও সাধারণ মুসলমানদের মাঝে অবিচলতা ও নিষ্ঠা তৈরী হবে। এর বিপরীত হলে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। মিথ্যা, প্রতারণা ও গায়রে শরয়ী নেতৃত্ব প্রদান করা স্বয়ং নিজের জন্য ফেতনার দ্বার উন্মুক্ত করবে। এমন নেতৃত্ব প্রত্যেক স্বার্থান্বেষীদের জন্য খারাপ আদর্শ হয়ে দাঁড়াবে। এটা তাদের নিজেদের জন্য ক্ষতির কারণ হবে এবং মুজাহিদ ও সাধারণ মুসলমানের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করবে।

পঞ্চদশ শিক্ষা

তোরাবোরা পাহাড়ে আমাদের পঞ্চদশ শিক্ষা হলো – বিভিন্ন গোত্র থেকে উপকৃত হওয়া – মুজাহিদদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি মুজাহিদরা বিভিন্ন গোত্রের নিষ্ঠাবান ও সৎ লোকদেরকে একত্র করতে পারে এবং তাদের পূর্বের অবস্থা জানতে পারে, তাহলে তারা (গোত্রের সদস্যরা) হয় মুজাহিদ হবে অথবা জিহাদের আনসার হবে।

পরিশেষে বলবো যে, তোরাবোরা পাহাড়ের স্মৃতিচারণ – মুসলিম উম্মাহ'র ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে আশা আকাংখার প্রেরণা ও উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলে মুসলিম

উম্মাহকে এই সুসংবাদ দিচ্ছে যে, চল্লিশটি ক্রুসেড রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত ন্যাটো বাহিনী তার সর্বোচ্চ শক্তি দিয়েও তিনশত এর মত মুজাহিদকে পরাজিত করতে পারে নি। এমন নজির ইতিহাস এর আগে কখনো দেখেনি। ন্যাটো জোটের সহযোগিতায় ছিল – পাকিস্তান, সৌদিআরব, তুরস্ক, মিসর, জর্ডান এবং উপসাগরীয় ছোট ছোট রাষ্ট্রসহ আরো অন্যান্য ভাড়াটে ভিক্ষুক রাষ্ট্রসমুহ যারা বশ্যতা ও দাসত্বের জীবণকে বরণ করে নিয়েছে।

হে মুসলিম উম্মাহ!

শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির আড়ালে নিজে আত্মসমর্পণ করা বা অন্যকে সমর্পণ করার কর্মপদ্ধতিগুলোকে ছুড়ে ফেলুন। ছুড়ে ফেলুন সেসব পাগড়ীওয়ালাদের কর্মপন্থাকে যারা আমেরিকান সৈন্যদলের সারিতে শামিল হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়ানোর বৈধতার ফতোয়া দিচ্ছে। যারা মুসলিম উম্মাহর দুর্বলতার অযুহাত দেখিয়ে বলছে যে, শান্তিপূর্ণ অবস্থান ও রক্তপাতহীন আন্দোলনগুলো বুলেটের চেয়েও অধিক কার্যকর।

আমাদেরকে বাস্তবতা বুঝতে হবে। এসকল পাগড়ীওয়ালারা বিভিন্ন দেশে শরিয়তের শাসনকে মেনে না নিয়ে জনগনের শাসনকে স্বীকৃতি দিয়ে আসছে এবং ঘোষণা করে যাচ্ছে যে, জাতীয়তাবাদের বন্ধন ইসলামী ভ্রাতৃত্বের চেয়েও উর্ধ্বে।

হে মুসলিম উম্মাহ!

আপনারা এসব ভ্রান্ত “মানহাজ ও মাসলাক”কে ছুড়ে ফেলুন। ক্রুসেডার ও তার ভাড়াটে সেনাদের হামলার মোকাবেলায় আপনারা এক কাতারে এসে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান।

হে মুসলিম উম্মাহ!

আপনারা একতাবদ্ধ হন, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের থেকে সতর্ক থাকুন। জাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারী এবং গোয়েন্দা বিভাগের লোকদেরকে নিজেদের ভাই হিসেবে গ্রহণ করা থেকে সতর্ক হন, কারণ এরাই জাতীয়তাবাদের সন্তান।

হে মুসলিম উম্মাহ!

আপনারা আমেরিকা ও তার ন্যাটো জোটের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হবেন না। তারা তো এক আল্লাহরই সৃষ্টি। তারা তো দুর্বল। তারা মৃত্যুকে ভয় পায় ও যন্ত্রণা অনুভব করে। পার্থিব হীন লোভ-লালসার পিছনে কুকুরের মত জিহবা বের করে হাঁপাতে থাকে।

আমেরিকা সকল মুসলিমকে দুটি শিবিরে ভাগ করেছে। এক. জঙ্গী ও উগ্র গোষ্ঠীর শিবির। দুই.শান্তি প্রিয় ও মানবতাবাদী গোষ্ঠীর শিবির। তাদের এই ভাগ দেখে আপনারা ভয় পাবেন না। আল্লাহর শপথ! তারা না পারে কাউকে মৃত্যু দিতে, আর না পারে কাউকে জীবন দান করতে। তারা কাউকে পুনরায় জীবিতও করতে পারে না।

হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ! আমরা আল্লাহর অনুগ্রহে ও তার আদেশে জঙ্গী গোষ্ঠী ও উগ্র গোষ্ঠী। শুনে রাখ হে কুফুরি শক্তি! আমেরিকার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমরা সংঘবদ্ধ হচ্ছি, একতাবদ্ধ হচ্ছি। আমরা চাই – আমেরিকাসহ তার দোসররা আমাদের মাথার মূল্য কোটি ডলার নির্ধারন করবে। কারণ এতে আমাদের দ্বীনের প্রতি অবিচলতা ও আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসই কেবল বৃদ্ধি পাবে, ইনশাআল্লাহ।

আমি এই বলে আলোচনার ইতি টানছি যে, শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ ঈদুল ফিতরের প্রথম দিনে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছিলেন। তাকে নিরাপদে ও সুস্থ শরীরে ফিরে পেয়ে আমার ও আমাদের সাথীদের খুশি ও আনন্দের সীমা ছিল না।

আলহামদুলিল্লাহ। আমি প্রথমে শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহকে সালাম দিয়েছি। দ্বিতীয়ত তাঁকে মুতানাব্বীর কবিতার একটি পঙক্তি বলে স্বাগত জানিয়েছি-

ولا اخصك في منجى بتهنئة * إذا سلمت فكل الناس قد سلموا

'আমি আপনাকে শুধু নিরাপদে থাকার স্বাগত জানাইনি।

বরং যেহেতু আপনি নিরাপদে বেঁচে আছেন

তাই এখন সকল মানুষ নিরাপদে বেঁচে থাকবে'।

## সমাপ্ত

(এই সংকলনটি শায়েখ আয়মান আল জাওয়াহিরীর বক্তৃতার সংকলন। বক্তৃতাগুলো অনলাইনে পাওয়া যেতে পারে। পরবর্তীতে হয়তো শায়েখ শহীদ হয়ে যাওয়ায় এই সিরিজের পরবর্তী পর্ব আর আসে নি। আল্লাহ শায়েখাইনকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন। আমাদেরকে তাদের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে কবুল করুন।)